হারুন ইয়াহিয়া

নাস্তিকত্ববাদের পতন

আলিমুল হক

অনূদিত

হারুন ইয়াহিয়া

নাস্তিকতাবাদের পতন

অনুবাদঃ আলিমুল হক

BCBS

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম-ঢাকা

www.amarboi.org

নাস্তিকতাবাদের পতন

মূলঃ হারুন ইয়াহিয়া

অনুবাদঃ আলিমুল হক

প্রকাশক

এস,এম, রইস উদ্দীন

পরিচালক (ইনচার্জ)

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

চট্টগ্রাম অফিস ঃ নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম।

ফোন ঃ ৬৩৭৫২৩

ঢাকা অফিস

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০। ফোন ঃ ৯৫৬৯২০১

গ্রন্থস্বত্ব ঃ জয়শ্রী জামান

প্রকাশকাল ঃ জানুয়ারী ২০০৫

মুদ্রাকর

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

১২৫, মতিঝিল বা/এ, ঢাকা।

ফোনঃ ৯৫৭১৩৬৪

প্রচ্ছদ ঃ আরিফুর রহমান

মূল্য ঃ ৫০.০০ টাকা

প্রাপ্তিস্থান

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

নিয়াজ মঞ্জিল, ৯২২ জুবিলী রোড, চট্টগ্রাম

১২৫ মতিঝিল বা/এ, ঢাকা-১০০০

১৫১-১৫২ গভঃ নিউমার্কেট, আজিমপুর, ঢাকা

৩৮/৪ মান্নান মার্কেট (২য় তলা), বাংলাবাজার, ঢাকা

Nastikotabadar Potan (A Turning Point in History: The Fall of Atheism), Written by Harun Yahya (Transalated By: Alimul Hoque, Published by: S.M. Raisuddin, Director (Incharge) Bangladesh Co-operative Book Society Ltd. 125 Motijheel C/A, Dhaka-1000. Price: Tk. 50.00 US$: 2.00 ISBN.984-493-090-1

www.amarboi.org

উৎসর্গ

আল্লাহ্‌র ওপর বিশ্বাস হারাতে যাঁকে কোনোদিন দেখিনি,

আমার আব্বা

খন্দকার আজিজুল হক-*এর*

করকমলে

www.amarboi.org

সূচিপত্র

অনুবাদকের কথা ৫
লেখক পরিচিতি ৭
নাস্তিকতাবাদের পতন ১১
আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রসঙ্গ ৫৪
মৃত্যু আমাদের যা শেখায় ৫৮

www.amarboi.org

অনুবাদকের কথা

অনেকটা আকস্মিকভাবেই হারুন ইয়াহিয়ার বিশাল কর্মযজ্ঞের সঙ্গে আমার পরিচয়। ইন্টারনেট ব্রাউজ করতে করতে সৌভাগ্যক্রমে একদিন ঢুকে পড়েছিলাম হারুন ইয়াহিয়ার ওয়েব সাইটে (www.harunyahya.com)। বিস্ময়ে হতবাক হয়ে গিয়েছিলাম তাঁর কাজের বহর দেখে। অসংখ্য গ্রন্থ আর নিবন্ধের ছড়াছড়ি! চাইলেই ডাউনলোড করা যায়!! একদম বিনে পয়সায়!!!

কিছুদিন গোগ্রাসে খাবার মতোই পড়লাম তাঁর গ্রন্থ ও নিবন্ধ। The Fall of Atheism, The Evolution Deceit, The Disasters Darwinism Brought to Humanity, Deep Thinking, The Real Origin of Life, Justice and Tolerance in the Qur'an ইত্যাদি বিষয়ের ওপর তাঁর জ্ঞানগর্ভ লেখা পড়তে পড়তে মনে হলো: এগুলো বাংলায় অনুবাদ করা উচিত। যেই ভাবা সেই কাজ। হারুন ইয়াহিয়ার গ্রন্থাবলী বাংলায় অনুবাদ করে তা প্রকাশের অনুমতি চেয়ে তাঁর কাছে ই-মেইল করলাম। তাঁর পক্ষ থেকে উত্তর দিলেন ভাই আমরে সুনেই (Emre Sunay)। ই-মেইল আদান-প্রদান চললো আরো কিছুদিন। এরপর হারুন ইয়াহিয়ার পক্ষ থেকে এলো লিখিত অনুমতিপত্র। আল্লাহর নাম নিয়ে অনুবাদের কাজে হাত দিলাম।

'নাস্তিকতাবাদের পতন' হারুন ইয়াহিয়ার A Turning Point in History: The Fall of Atheism-শীর্ষক একটি ছোটো গ্রন্থের অনুবাদ। এ-অনুবাদটি দৈনিক ইত্তেফাকে 'নিরীশ্বরবাদের পতন: ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ' শিরোনামে ধারাবাহিকভাবে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এ-বইটির শেষভাগে, প্রাসঙ্গিক মনে হওয়ায়, হারুন ইয়াহিয়ার দুটি নিবন্ধের

www.amarboi.org

অনুবাদও সংযোজন করে দেয়া হয়েছে। নিবন্ধ দুটি হলোঃ 'আল্লাহর অস্তিত্ব প্রসঙ্গ' (The Obvious Existence of God) এবং 'মৃত্যু আমাদের যা শেখায়' (The Lessons from Death)।

দাবি করছি না যে, নির্ভুলভাবে অনুবাদের কাজটা করতে পেরেছি। তবে চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। যথাসম্ভব সহজ-সরল ভাষা ব্যবহারের চেষ্টা করেছি। যেখানে আক্ষরিক অনুবাদ প্রয়োজনের দাবি মিটিয়েছে, সেখানে আক্ষরিক অনুবাদই করেছি। আবার কোনো কোনো স্থানে, প্রয়োজনের দাবি মেটাতেই, ভাবানুবাদের আশ্রয় নিয়েছি। উভয়ক্ষেত্রেই লক্ষ্য ছিল মূল লেখকের বক্তব্যকে বাংলা ভাষাভাষী পাঠকদের বোধগম্য করে উপস্থাপন করা। কতটুকু সফল হয়েছি, সে-বিচার করবেন পাঠক।

আলিমুল হক
দৈনিক ইত্তেফাক
২০০৫

www.amarboi.org

লেখক পরিচিতি

হারুন ইয়াহিয়া

হারুন ইয়াহিয়া তুরস্কের আংকারায় জন্মগ্রহণ করেন **১৯৫৬** সালে। হারুন ইয়াহিয়া নামে তিনি সুপ্রসিদ্ধ হলেও, এটি আসলে তাঁর ছদ্মনাম *(pen-name)*। তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম হচ্ছে **আদনান ওকতার** *(Adnan Oktar)*।

আংকারাতেই তাঁর জীবন কেটেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেণীতে অধ্যয়নের সময় থেকেই তিনি নিজেকে ইসলামের খেদমতে পেশ করার অদম্য আকাঙ্খা পোষণ করতে শুরু করেন। এ-সময় তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেন, বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে প্রভূত জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি মিমার সিনান বিশ্ববিদ্যালয়ে *(Mimar Sinan University)* পড়ার জন্য ইস্তাম্বুল গমন করেন। এ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি মানুষকে বিশ্বাসের দিকে এবং ইসলামী মূল্যবোধের দিকে আহ্বান করাকে জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করেন।

www.amarboi.org

বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হয়েই তিনি দেখলেন যে, সেখানে নাস্তিকতাবাদী বা নিরীশ্বরবাদী চিন্তা-চেতনার জয়-জয়কার। শিক্ষকরা সুযোগ পেলেই বস্তুবাদী দর্শন ও ডারউইনবাদ নিয়ে আলোচনায় মেতে উঠতে উৎসাহী। অনেক সময় তাঁরা অপ্রাসঙ্গিকভাবে আলাচনায় বস্তুবাদ ও ডারউইনবাদ টেনে আনেন এবং এসব বাদ-এর পক্ষে সাফাই গেয়ে বেড়ান। এমনই এক পরিবেশে আদনান ওকতার তাঁর আশপাশের মানুষজনকে সত্যের দিকে, আল্লাহর দিকে আহ্বান করতে শুরু করলেন। তাঁর মাতা মেদিহা ওকতার *(Mediha Oktar)* বলছেন যে, ওই সময় আদনান রাতের খুব কম সময়ই ঘুমাতেন এবং অধিকাংশ সময় পড়াশোনা করতেন ও প্রয়োজনীয় নোট নিতেন। এভাবে তিনি শত শত গ্রন্থ আত্মস্থ করে ফেলেন। ওসব গ্রন্থের মধ্যে ছিল মার্কসবাদ, বস্তুবাদ, ও ধর্মহীন আদর্শের ওপর লেখা অনেক রচনা। ওসময় তিনি ডারউইনবাদের ওপরও ব্যাপক গবেষণা করেন। সংশ্লিষ্ট বিষয়সমূহের ওপর ব্যাপক দখল অর্জনের পর তিনি মার্কসবাদ, নিরীশ্বরবাদ, বস্তুবাদ, ডারউইনবাদ ইত্যাদির চুলচেরা বিশ্লেষণ করার মাধ্যমে সেগুলোর অসারতা প্রমাণে প্রবৃত্ত হন।

তাঁর তৎপরতা অনেকেরই পছন্দ হচ্ছিল না। বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু উগ্র ছাত্র তাঁকে হুমকি পর্যন্ত দিতে শুরু করে। কিন্তু কোনো হুমকি-ধামকিতে টলার পাত্র নন আদনান ওকতার। তিনি তাঁর কাজ চালিয়ে গেলেন। তিনি ক্লাশে পর্যাপ্ত বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ ও পবেষণাপত্র নিয়ে ঢুকতেন এবং বস্তুবাদ ও ডারউইনবাদে বিশ্বাসী অধ্যাপকদের যুক্তি *(বস্তুবাদ ও ডারউইনবাদের পক্ষে)* খন্ডন করতেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনটি বছর তিনি ছিলেন সম্পূর্ণ একা। অন্যান্য শিক্ষার্থীরা তাঁর বক্তব্য শুনলেও, কেউ ওই সময় তাঁর পাশে গিয়ে দাঁড়ায়নি। একা লড়ে গেছেন আদনান ওকতার।

অবশেষে, ১৯৮২ সালে গুটিকতক শিক্ষার্থী প্রথমবারের মতো তাঁর পাশে এসে দাঁড়ায়। তবে পরবর্তী দুই বছরে তাঁর শিষ্যের সংখ্যা বেড়ে ২০-৩০ জনের বেশী হয়নি। ১৯৮৪ সালের পর তিনি ইস্তাম্বুল বিশ্ববিদ্যালয়ের

www.amarboi.org

দর্শন বিভাগে ভর্তি হন। ১৯৮৬ সালে তাঁর নাম 'নোকতা' *(Nokta)*-নামক একটি ম্যাগাজিনে প্রকাশিত হয় এবং জনগণ প্রথমবারের মতো তাঁর সম্পর্কে জানতে পারে।

তাঁর কর্মতৎপরতা ক্ষমতাসীনদের অনেকেরই পছন্দ ছিল না। তাঁর ক্রমবর্ধমান জনপ্রিয়তা তাদের উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। বিশেষ করে বস্তুবাদ ও ডারউইনবাদের জাল থেকে ক্রমবর্ধমানহারে তরুণদের বেরিয়ে-আসা এবং ধর্মীয় জীবনযাপন শুরু করাটা অনেকেই ভালো চোখে দেখেনি। ১৯৮৬ সালের গ্রীষ্মে, মিথ্যা অভিযোগ এনে, তাঁকে প্রথমবারের মতো গ্রেফতার করা হয়। তাঁকে *Bakirkoy Mental Hospital*-এ জোর করে ভর্তি করে দেয়া হয় এই অভিযোগে যে, তিনি মানসিকভাবে অসুস্থ। ১৯ মাস পর, তাঁর বিরুদ্ধে কোনোধরণের অভিযোগই প্রমাণিত না-হওয়ায়, আদালত তাকে সসম্মানে মুক্তি দেয়। জেল ও মানসিক হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়ে তিনি দেখতে পান যে, তাঁর অনুসারীর সংখ্যা নাটকীয়ভাবে বেড়ে গেছে।

১৯৯০ সালের জানুয়ারিতে আদনানের নেতৃত্বে Science Research Foundation *(SRF)* প্রতিষ্ঠিত হয়। কিছুদিনের মধ্যেই পুলিশ এসআরএফ-এর শতাধিক সদস্যকে গ্রেফতার করে এবং কোনো অজুহাতের ফাঁদে ফেলতে না-পেরে ছেড়ে দেয়। কিন্তু ধর্মবিরোধী পত্র-পত্রিকাগুলো আদনান ও তাঁর ফাউন্ডেশান নিয়ে মিথ্যাচার চালিয়ে যেতেই থাকে।

১৯৯০ সালে তাকে আরো একবার গ্রেফতার করা হয়। এবার কোকেইন রাখা ও সেবনের অপরাধে! কিন্তু শেষ পর্যন্ত প্রমাণিত হয় যে, আদনান কোকেইন সংগ্রহও করেননি, সেবনও করেননি। গোটা ব্যাপারটাই ছিল সাজানো এবং উদ্দেশ্য ছিল আদনানকে ফাঁসানো। কিন্তু সে বদ উদ্দেশ্য

www.amarboi.org

ব্যর্থ হয় এবং তিনি সসম্মানে আবারো মুক্তি পান। ১৯৯৯ সালের ১২ নভেম্বর পুলিশ তাঁর ফাউন্ডেশানে আরো একবার তল্লাশি অভিযান চালায়।

বস্তুত কোনো চাপ বা ষড়যন্ত্রই আদনান ওকতার ও তাঁর Science Research Foundation-এর অগ্রগতিকে দমিয়ে রাখতে পারেনি। এ-পর্যন্ত 'হারুন ইয়াহিয়া' ছদ্মনামে আদনান ওকতার রাজনৈতিক, বৈজ্ঞানিক, ও ধর্মীয় ইস্যুতে ১৯০-টির বেশী গ্রন্থ রচনা করেছেন এবং ১৪টি ডকুমেন্টারি ও ডারউইবাদের ওপর কয়েক ডজন প্রামাণ্যচিত্র তৈরী করেছেন। তাঁর গ্রন্থাবলী ইতিমধ্যেই ইংরেজী, ফরাসী, জার্মানি, ইতালিয়ান, পর্তুগিজ, উর্দু, আরবী, আলবেনিয়ান, রুশ, বোসনিয়ান, ইন্দোনেশিয়ান ইত্যাদি ভাষায় অনুদিত হয়েছে *(আল্লাহর রহমতে বাংলা ভাষায় অনুবাদের কাজও শুরু হয়ে গেছে)*। বলা বাহুল্য, এসব কাজে সায়েন্স রিসার্চ ফাউন্ডেশানের ভূমিকা বরাবরই ছিল গুরুত্বপূর্ণ।

শত বাঁধা-বিপত্তি সত্ত্বেও আদনান ওকতার ওরফে হারুন ইয়াহিয়ার সত্যের পথে পদচারণা কেউ বন্ধ করতে পারেনি। সবাই জানেন, যে-সময়ে তিনি তাঁর মিশন নিয়ে মাঠে নেমেছিলেন সে-সময়ে তুরস্কে কাজটা কত কঠিন ছিল। কিন্তু শত প্রতিকূলতার বিরুদ্ধে তিনি যুদ্ধ শুরু করেছিলেন একা। এখন সে-যুদ্ধে তাঁর সহযোদ্ধা হিসেবে আছেন তুরস্ক ও তুরস্কের বাইরে অনেকেই। এ-যুদ্ধে তাদের অস্ত্র হচ্ছে কলম। আফটার অল, পেন ইজ মাইটার দেন দি সোর্ড! ■

www.amarboi.org

প্রকাশকের কথা

বিখ্যাত বিজ্ঞানী ভিসকাউন্ট স্যামুয়েল Belief and Action নামক গ্রন্থে বলেছেনঃ ".... Science has made atheism impossible." (বিজ্ঞান নাস্তিকতাকে অসম্ভব করে তুলেছে।) হারুন ইয়াহিয়ার A Turning Point in History: The Fall of Atheism নামক গ্রন্থটি পাঠ করলে স্যামুয়েল সাহেবের কথা সত্যতা আরো একবার প্রমাণিত হয়। লেখক হারুন ইয়াহিয়া মূলত বিজ্ঞান দিয়েই প্রমাণ করেছেন যে, নাস্তিকতাবাদের কোনো ভিত্তি নেই। বাস্তবিকই বিজ্ঞান যত সামনে এগুচ্ছে, নাস্তিকতাবাদ ততই দুর্বল থেকে দুর্বলতর হচ্ছে। একজন মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব যারা অস্বীকার করতে চান, তাদের সামনে এখন আর বিজ্ঞানের দোহাই দেয়ার কোনো সুযোগ নেই।

হারুন ইয়াহিয়া তুরস্কের একজন স্বনামধন্য ইসলামী স্কলার। এটি তার ছদ্মনাম। এ-নামেই তিনি বিশ্বব্যাপী খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার লিখিত অনেক গ্রন্থের একটির অনুবাদ হচ্ছে 'নাস্তিকতাবাদের পতন' নামক এ-গ্রন্থটি। গ্রন্থটি অনুবাদ করেছেন আলিমুল হক। দৈনিক ইত্তেফাকের তরুন সাংবাদিক ও কলামিস্ট তিনি। এটি কোনো বিজ্ঞানের গ্রন্থ নয়, তবে বিজ্ঞানের নানান বিষয় গ্রন্থটিতে স্থান পাওয়ায় অনুবাদের কাজটি বেশ কঠিন ছিল। কিন্তু এ-কঠিন কাজটি তিনি বেশ দক্ষতার সঙ্গেই করেছেন। বাংলা ভাষাভাষি মানুষ অনুবাদ গ্রন্থটি পাঠ করে, মূল গ্রন্থ পাঠের স্বাদ পাবেন বলে আশা করছি।

যেমনটি অনুবাদক বলেছেন, A Turning Point in History : The Fall of Atheirsm নামক গ্রন্থটির অনুবাদ ধারাবাহিকভাবে ইতিমধ্যেই দেশের সবচে প্রভাবশালী ও প্রেস্টিজিয়াস বাংলা দৈনিক ইত্তেফাকে প্রকাশিত হয়েছে। দৈনিক ইত্তেফাকের পাঠকদের মধ্যে ওই ধারাবাহিক অনুবাদকর্মটি বেশ সাড়া জাগাতেও সক্ষম হয়েছে। আশা করছি, গ্রন্থ আকারে প্রকাশিত হবার পরও অনুবাদকর্মটি পাঠকদের কাছে সমাদৃত হবে। গ্রন্থটি পাঠকদের মনের সন্দেহ দূর করবে বলে আমাদের বিশ্বাস, এটি তাদের বিশ্বাসকে করবে দৃঢ়তর।

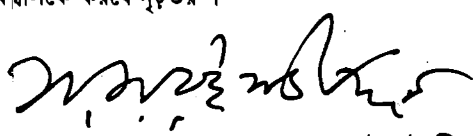

এস এম রইসউদ্দীন
(পরিচালক ইনচার্জ)
বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ

www.amarboi.org

নাস্তিকতাবাদের পতন

ইতিহাসের সন্ধিক্ষণ বলে একটি কথা আছে। আমরা বর্তমানে তেমনি একটি সন্ধিক্ষণে (turning point) বাস করছি। কেউ একে *বিশ্বায়ন* বলছেন, কেউ বলছেন এটি 'তথ্যযুগের' সূচনা। এ-সবই সত্য। তবে এ-সময়ে আমরা আরো একটি বিষয় লক্ষ্য করছি, যা তার চেয়েও গুরুত্বপূর্ণ। অনেকের অগোচরেই বিগত ২০-২৫ বছরে বিজ্ঞান ও দর্শনের ক্ষেত্রে পৃথিবী অনেক দূর এগিয়ে গেছে এবং এর ফলে নাস্তিকতাবাদ বা নিরীশ্বরবাদ-এর কফিনে শেষ পেরেকটি ঠুকে দেয়ার আয়োজন সম্পন্ন হতে চলেছে–অনেকটা অবধারিতভাবে।

একথা সত্য যে, নিরীশ্বরবাদ তথা আল্লাহর অস্তিত্বকে অস্বীকার করার ধারণা প্রাচীনকাল থেকেই মানবসমাজে ছিল। কিন্তু এর সত্যিকারের উত্থান শুরু হয়েছিল মূলত অষ্টাদশ শতাব্দীতে, ইউরোপে। ধর্মবিরোধী একদল চিন্তাবিদের দর্শনের ব্যাপক প্রসার ও মানবসমাজে এর রাজনৈতিক প্রভাব ওই উত্থানকে যুগিয়েছিল প্রয়োজনীয় পুষ্টি। ডিডেরট *(Diderot)* ও বেরন ডি হোলবাখ *(Baron d' Holbach)*-এর মতো বস্তুবাদীরা তখন প্রচার করছিলেন যে, বিশ্বজগত হচ্ছে বস্তুর সমষ্টি এবং এ-জগত অনাদিকাল থেকেই অস্তিত্বশীল; বস্তুর বাইরে এ-জগতে আর কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। ঊনবিংশ শতাব্দীতে এসে নিরীশ্বরবাদ আরো প্রসার লাভ করে; মার্কস, এঙ্গেলস, নিৎসে, দুরখেইম, ফ্রয়েড প্রমুখ চিন্তাবিদরা বিজ্ঞান ও দর্শনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে নিরীশ্বরবাদী চিন্তা-ভাবনার প্রয়োগ করেন।

নিরীশ্বরবাদের পক্ষে সবচে বড় সমর্থনটি এসেছিল চার্লস ডারউইনের কাছ থেকে। তিনি সৃষ্টির ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন এবং এর

www.amarboi.org

বিপরীতে পেশ করেন বিবর্তন তত্ত্ব *(theory of evolution)*। তার তত্ত্ব তথা ডারউইনবাদ আপাতদৃষ্টিতে এমন একটি প্রশ্নের বৈজ্ঞানিক (?) উত্তর দিয়েছিল, যেটি যুগের পর যুগ ধরে নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিকদের বিব্রত করে এসেছে। প্রশ্নটি হচ্ছেঃ কীভাবে পৃথিবীতে মানুষ এবং অন্যান্য জীবিত বস্তুর আবির্ভাব ঘটেছে? ডারউইনের তত্ত্বের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে অনেক নিরীশ্বরবাদীই বিশ্বাস করতে ও তা প্রচার করতে শুরু করলেন যে, প্রকৃতিতে এমন একটা মেকানিজম *(mechanism)* ক্রিয়াশীল আছে যা জড় পদার্থের মধ্যে প্রাণসঞ্চার করতে পারে এবং সে-মেকানিজমই–আল্লাহ নন–পৃথিবীতে লক্ষ-কোটি বিভিন্ন প্রজাতির প্রাণী সৃষ্টি করেছে।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে নিরীশ্বরবাদীরা বিশ্বজগত সম্পর্কে এমন একটা ধারণা দিলেন যা–তাঁদের মতে–এ-জগতের সবকিছুকে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম। এ-বিশ্বজগতের সৃষ্টি হয়েছে–এ-সত্যকে তাঁরা মেনে নিতে অস্বীকার করলেন। তাঁরা ঘোষণা করলেনঃ বিশ্বজগতের কোনো শুরু নেই; এটি অনাদিকাল থেকেই অস্তিত্বশীল ছিল এবং ভবিষ্যতেও থাকবে। তাঁরা দাবী করে বসলেন যে, এ-জগতের কোনো লক্ষ্য নেই; এর চমৎকার শৃঙ্খলা এবং ভারসাম্যপূর্ণ পরিবেশের অস্তিত্বের বিষয়টি স্রেফ একটা ঘটনাচক্র মাত্র *(অর্থাৎ এর পেছনে কোনো বুদ্ধিমান স্রষ্টার হাত নেই)*। তাঁরা ডারউইনবাদের ওপর পূর্ণ ঈমান আনলেন বা বিশ্বাস স্থাপন করলেন। জগতে অসংখ্য প্রাণীর অস্তিত্বের ব্যাপারটি ডারউইনিজম দিয়ে ব্যাখ্যা করা সম্ভব বলে তাঁরা ঘোষণা দিলেন। তাঁরা আরো বিশ্বাস করে বসলেন যে, নাস্তিক্যবাদী ধারণা-অনুমানের ওপর ভিত্তি করে মার্কস বা দুরখেইম *(Durkheim)* ইতিহাস ও সমাজবিজ্ঞানকে এবং ফ্রয়েড মনোবিজ্ঞানকে যথাযথভাবে ব্যাখ্যা করতে সক্ষম হয়েছেন।

পরবর্তী কালে তথা বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞান প্রভূত উন্নতি সাধন করলো, আবিষ্কৃত হলো নিত্যনতুন সত্য ও তত্ত্ব ; রাজনৈতিক ও সামাজিক অঙ্গনও আলোকিত হলো নতুন ধারণা ও সত্যের আলোয়। এর

www.amarboi.org

ফলে নাস্তিক্যবাদী ধারণা ও বিশ্বাসের মূলে কুঠারাঘাত পড়লো। জ্যোতির্বিদ্যা, জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও সমাজবিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে গবেষণার ফলে বেরিয়ে-আসা সত্য, নিরীশ্বরবাদের ভিত্তিকে নড়বড়ে করে দিল।

জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির স্কলার প্যাট্রিক গ্লাইন *(Patrick Glynn)* তাঁর God: The Evidence, The Reconcilliation of Faith and Reason in a Postsecular World -শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন: *"প্রাথমিক পর্যায়ের আধুনিক ধর্মনিরপেক্ষ ও নাস্তিক চিন্তাবিদরা সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহ সম্পর্কে যে-সব গুরুত্বপূর্ণ অনুমান ও ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন, তার প্রায় সবগুলোই বিগত দুই দশকের গবেষণায় ভুল প্রমাণিত হয়েছে। তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন যে, বিজ্ঞান এ-বিশ্বজগতকে আরো বেশী বিশৃঙ্খল ও যান্ত্রিক হিসেবে প্রমাণ করবে। কিন্তু বাস্তবে প্রমাণিত হলো ঠিক উল্টোটি–বিশ্বজগতে এক আশ্চর্য জটিল শৃঙ্খলা আবিষ্কার করলো বিজ্ঞান, যা এক অকল্পনীয় বিশাল পরিকল্পনা তথা পরিকল্পনাকারীর প্রতি সুস্পষ্ট ইঙ্গিত প্রদান করে। আধুনিক মনোবিজ্ঞানীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, একসময় ধর্ম একটি স্নায়বিক রোগ হিসেবে চিহ্নিত হবে; কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, ধর্মীয় চেতনা মৌলিক মানসিক স্বাস্থ্য সুরক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে ...*

দৃশ্যত খুব কম লোকই বিষয়টি উপলব্ধি করছে বলে মনে হয়; তবে বিজ্ঞান ও বিশ্বাসের মধ্যকার শতাব্দী-প্রাচীন বিতর্কের ফলাফল যে বিস্ময়কর, তা এতক্ষণে স্পষ্ট হয়ে যাবার কথা। ডারউইনের অব্যবহিত পরে হাক্সলি ও রাসেলের মতো নাস্তিক ও অজ্ঞেয়বাদীরা 'দৈবক্রমে বিশ্বজগত ও পৃথিবীতে প্রাণের সৃষ্টির তত্ত্ব' তুলে ধরেছিলেন, যা অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্যও মনে হয়েছিল। আজও কোনো কোনো বিজ্ঞানী ও বুদ্ধিজীবী এ-তত্ত্বকে আঁকড়ে ধরে আছেন। তাঁরা এ-তত্ত্বর পক্ষ অবলম্বন করতে যেয়ে অবাস্তব সব কথাবার্তা বলছেন বা বলতে বাধ্য হচ্ছেন। অথচ অত্যাধুনিক গবেষণা থেকে প্রাপ্ত বাস্তব ও গ্রহণযোগ্য উপাত্তসমূহ একজন

www.amarboi.org

সৃষ্টিকর্তা তথা আল্লাহর অস্তিত্বের অনিবার্যতাকেই প্রবলভাবে প্রকাশ করছে।"

নাস্তিক্যবাদী বা বস্তুবাদী দর্শনের ভিত্তি হিসেবে এতদিন অবাধে উপস্থাপন করা হতো বিজ্ঞানকে। বর্তমানে ঠিক উল্টোটাই ঘটছে। জেরাল্ড শ্রোয়েডার *(Gerald Shroeder)*-এর The Hidden Face of God গ্রন্থের ওপর লেখা এক পর্যালোচনামূলক নিবন্ধে ব্রাইস ক্রিস্টেনসেন *(Bryce Christensen)* লিখেছেন: *"গবেষণাগার থেকে ও বিভিন্ন পর্যবেক্ষণ থেকে প্রাপ্ত তথ্যসমূহ ব্যাখ্যা করতে বস্তুবাদ অক্ষম।"*

যা হোক, এ-ইস্যুতে বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখা যে-সব সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, সে-সব সংক্ষেপে আমরা এখানে আলোচনা ও বিশ্লেষণ করবো এবং আসন্ন 'নাস্তিকতা-পরবর্তী' যুগ মানবজাতির জন্য কী বয়ে আনবে বা আনতে পারে, তা-ও এখানে তুলে ধরার চেষ্টা করবো:-

www.amarboi.org

বিশ্বতত্ত্ব :
'বিশ্বজগত অনাদি ও অনন্ত'–এ-ধারণার অসারতা

বিংশ শতাব্দীতে নিরীশ্বরবাদের ওপর প্রথম আঘাতটি আসে বিজ্ঞানের বিশ্বতত্ত্ব *(cosmology)* নামক শাখা থেকে। এ-বিশ্বজগতের কোনো শুরু নেই, এটি অনাদিকাল থেকে অস্তিত্বশীল ছিল এবং অনন্তকাল পর্যন্ত থাকবে–এ ধারণা এ-সময় মিথ্যা প্রমাণিত হয়; আবিষ্কৃত হয়–এ-বিশ্বজগতের একটা শুরু ছিল। সোজাভাবে বললে, এটা বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত হয় যে, এ-বিশ্বজগত শূন্য থেকে *(from nothing)* সৃষ্টি করা হয়েছে।

অনাদি ও অনন্ত বিশ্বজগতের ধারণা পাশ্চাত্যে এসেছিল বস্তুবাদী দর্শনের কাঁধে ভর করে। প্রাচীন গ্রীসে এ-দর্শনের জন্ম। এ-দর্শন অনুসারেঃ এ-বিশ্বজগত অনাদিকাল থেকে চলে আসছে ও অনন্তকাল পর্যন্ত চলবে এবং বস্তুর বাইরে এ-বিশ্বজগতে অন্য কোনো কিছুর অস্তিত্ব নেই। যেহেতু মধ্যযুগে পাশ্চাত্যে চার্চের দোর্দণ্ড প্রতাপ ছিল, বস্তুবাদ সেখানে তখন ততটা পাত্তা পায়নি। আধুনিক যুগে এসে পশ্চিমা বিজ্ঞানী ও দার্শনিকরা গ্রীক দর্শনের দিকে ঝুঁকে পড়েন এবং এর ফলে বস্তুবাদ আবার পাদ-প্রদীপে চলে আসে।

বিখ্যাত জার্মান দার্শনিক ইমানুয়েল কান্ট *(Immanual Kant)* 'বস্তুবাদী' শব্দটির প্রচলিত অর্থে বস্তুবাদী ছিলেন না। অথচ আধুনিক যুগে তিনিই হচ্ছেন প্রথম ব্যক্তি যিনি বিশ্বজগতকে বস্তুবাদের আলোকে ব্যাখ্যা

www.amarboi.org

করেন। কান্ট ঘোষণা করেন: এ-বিশ্বজগত অনাদি ও অনন্ত এবং কোনো কিছুই বিশ্বজগতের বাইরে নয়। ঊনবিংশ শতাব্দী যখন শুরু হলো, তখন ব্যাপকভাবে এ-ধারণা গৃহীত হয়ে গেছে যে, এ-বিশ্বজগতের কোনো শুরু নেই এবং একে সৃষ্টিও করা হয়নি। পরবর্তী কালে কার্ল মার্কস *(Karl Marx)* ও এঙ্গেলস *(Friedrich Engels)*-এর মতো দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদীরা এ-ধারণাকে সমর্থন করেন এবং ধারণাটি বিংশ শতাব্দীর শুরু থেকেও কমবেশি গুরুত্ব পেতে থাকে।

ইমানুয়েল কান্ট

অনাদি ও অনন্ত বিশ্বের ধারণা সবসময়ই নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে সঙ্গতিপূর্ণ ছিল। বিশ্বজগত কোনো এক সময় শুরু হয়েছিল—এ-ধারণা মেনে নেয়ার অর্থ একজন স্রষ্টাকে মেনে নেয়া। তাই—বৈজ্ঞানিক কোনো ভিত্তি না-থাকা সত্ত্বেও—দাবী করা হলো যে, বিশ্বজগত অনাদি ও অনন্ত। এ-দাবী যারা করতেন তাদের মধ্যে ছিলেন জর্জেস পলিটজার *(Georges Politzer)*-ও। তিনি বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে *Principes Fondamentaux de Philosophie (The Fundamental Principles of Philosophy)*-নামক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে বস্তুবাদ ও মার্কসবাদের একজন গোড়া সমর্থক হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। অনাদি ও অনন্ত বিশ্বজগতের ধারণাকে অকাট্য মেনে নিয়ে তিনি সৃষ্টির ধারণাকে প্রত্যাখ্যান করেন। তিনি লেখেন: *"বিশ্বজগত কোনো সৃষ্ট বস্তু নয়। এটি সৃষ্ট হলে অবশ্যই একে শূন্য থেকে তাৎক্ষণিকভাবে একজন স্রষ্টা কর্তৃক সৃষ্ট হতে হতো। সৃষ্টির ধারণা মেনে নিতে হলে এ-কথাও মেনে নিতে হয় যে, এমন একটা সময় ছিল যখন বিশ্বজগতের অস্তিত্ব ছিল না এবং আরো মেনে নিতে হয় যে, শূন্য থেকে কোনো কিছু সৃষ্টি করা সম্ভব। অথচ এটি এমন এক কথা যা বিজ্ঞান মেনে নিতে পারে না।"*

www.amarboi.org

সৃষ্টির ধারণার বিরুদ্ধে এবং অনাদি ও অনন্ত বিশ্বজগতের ধারণার পক্ষে অবস্থান নিয়ে পলিটজার ভেবেছিলেন, বিজ্ঞান তাঁর পক্ষে আছে। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল বিজ্ঞান তাঁর পক্ষে নেই। সহসাই বিজ্ঞান আবিষ্কার করলো, বিশ্বজগতের একটা শুরু ছিল। আর বিশ্বজগতের শুরু যখন আছে, তখন—পলিটজারের বিচারেই—একজন স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার না-করে উপায় থাকে না।

বিশ্বজগত যে অনাদি নয়, এক সময় যে এটি শূন্য থেকে সৃষ্টি হয়েছিল—এ-সত্য জানা যায় 'বিগ ব্যাং' *(Big Bang)* তত্ত্বের আবিষ্কারের ফলে। বিংশ শতাব্দীর সম্ভবত সবচে' গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার এটি। বস্তুত, একাধারে অনেকগুলো আবিষ্কারের ফসল হিসেবে বিগ ব্যাং তত্ত্বের জন্ম। ১৯২৯ সালে আমেরিকার জ্যোতির্বিদ এডউইন হাবল *(Edwin Hubble)* লক্ষ্য করেন যে, বিশ্বজগতের গ্যালাক্সিগুলো পরস্পর থেকে ক্রমশ দূরে সরে যাচ্ছে। অন্যভাবে বললে, তিনি আবিষ্কার করলেন, বিশ্বজগত ক্রমশ সম্প্রসারিত হচ্ছে। এ-আবিষ্কার সংশ্লিষ্ট বিজ্ঞানীদের একটা সিদ্ধান্তে উপনীত হতে বাধ্য করলো। সিদ্ধান্তটি হলোঃ এ-বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে একটি একক পয়েন্ট *(single point)* থেকে। জ্যোতির্বিদরা হাবলের আবিষ্কারের সারবত্তা পরীক্ষা করতে যেয়ে আবিষ্কার করলেন আরেকটি সত্য। সত্যটি হচ্ছে : বিশ্বজগত যে-একক পয়েন্ট বা বিন্দু থেকে সৃষ্টি হয়েছে, সেটির মাধ্যাকর্ষণশক্তি ছিল অসীম এবং ভর *(mass)* ছিল শূন্য; আর এই ভরহীন পয়েন্টে এক প্রচণ্ড বিস্ফোরণের ফলেই বস্তু ও সময় অস্তিত্বলাভ করে এবং সৃষ্টি হয় সম্প্রসারণশীল *(expanding)* এ-বিশ্বজগতের। অন্যভাবে বললে, এ-বিশ্বজগত সৃষ্টি হয়েছে শূন্য *(nothing)* থেকে।

বিগ ব্যাং বা 'মহা-বিস্ফোরণ তত্ত্ব' আবিস্কৃত হলেও, অনেক জ্যোতির্বিদই একে সত্য বলে মেনে নিতে অস্বীকার করলেন এবং অনাদি বিশ্বজগতের পুরনো বিশ্বাসই আঁকড়ে ধরে থাকলেন। এ-গোড়ামীর কারণ

www.amarboi.org

খুজে পাওয়া যাবে বিখ্যাত বস্তুবাদী পদার্থবিদ আর্থার এডিংটনের *(Arthur Eddington)* বক্তব্যে। তিনি বলেছিলেন: *"বর্তমানে আমরা যে-প্রকৃতি দেখছি, সেটি একসময় আকস্মিকভাবে অস্তিত্বলাভ করতে শুরু করেছিল–এ-ধারণা আমার কাছে ফিলসফিক্যালি (phylosophically) অগ্রহণযোগ্য।"* বস্তুবাদীদের কাছে অগ্রহণযোগ্য হলেও, বিগ ব্যাং তত্ত্ব কিন্তু পরবর্তী কালে বিভিন্ন সুস্পষ্ট বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের দ্বারা সত্য প্রমাণিত হতে থাকে। ঊনবিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকে আরনো পেনজিয়াস *(Arno Penzias)* ও রবার্ট উইলসন *(Robert Wilson)* নামক দুজন বিজ্ঞানী মহা-বিস্ফোরণের *(Big Bang)* তেজস্ক্রিয় অবশেষ *(radioactive remains)* চিহ্নিত করেন। নব্বই-এর দশকে কোবে *(COBE, Cosmic Background Explorer)* স্যাটেলাইট বিজ্ঞানী দুজনের পর্যবেক্ষণের সত্যতা প্রমাণ করে।

এসব সত্য আবিষ্কারের ফলে কোনঠাসা হয়ে পড়ে নাস্তিকরা। প্রসঙ্গক্রমে, 'Atheistic Humanism'-এর লেখক ও University of Reading-এর দর্শনের নাস্তিক অধ্যাপক এন্থনি ফ্লিউ *(Anthony Flew)*-এর আগ্রহউদ্দীপক স্বীকারোক্তির কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। তিনি বলছেন: *"স্বীকারোক্তি আত্মার জন্য ভালো বলে কুখ্যাতি আছে। আমি স্বীকার করছি যে, সৃষ্টিতত্ত্বসংক্রান্ত সমকালীন সর্বসম্মত মত নাস্তিকদের ভালোরকম বিব্রত করবে। কারণ, বিশ্বজগতের একটা শুরু ছিল–এ-কথাটা St. Thomas-এর মতে ফিলসফিক্যালি প্রমাণ করা সম্ভব না-হলেও, দেখা যাচ্ছে, সৃষ্টিতত্ত্ববিদরা এর সপক্ষে বৈজ্ঞানিক প্রমাণ ঠিকই হাজির করছেন। ...(বিশ্বজগতের কোনো শুরু বা শেষ নেই–এ ধারণাটা) যদিও আমি এখনো সঠিক বলেই বিশ্বাস করি, তথাপি বলতেই হচ্ছে যে, বিগ ব্যাং তত্ত্বের উপস্থিতিতে ওই বিশ্বাসের ওপর স্থির থাকা মোটেই সহজ ও স্বস্তিদায়ক ব্যাপার নয়।"*

www.amarboi.org

বিগ ব্যাং তত্ত্বের বিরুদ্ধে নাস্তিকদের ক্ষোভ প্রকাশ করার আরো উদাহরণ আছে। ১৯৮৯ সালে লিখিত এক নিবন্ধে বিখ্যাত বস্তুবাদী বিজ্ঞান জার্নাল Nature-এর নিরীশ্বরবাদী সম্পাদক জন মেডক্স *(John Maddox)* এ-তত্ত্বের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন। 'বিগ ব্যাং নিপাত যাক'-শীর্ষক ওই নিবন্ধে মেডক্স লিখেছেন যে, বিগ ব্যাং 'ফিলসফিক্যালি অগ্রহণযোগ্য'। তিনি আরো ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, বিগ ব্যাং তত্ত্ব পরবর্তী দশকে টিকে থাকবে এমন সম্ভাবনা কম। বলা বাহুল্য, মেডক্সের ভবিষ্যদ্বাণী সঠিক প্রমাণিত হয়নি, বরং উল্টো এ-তত্ত্বের গ্রহণযোগ্যতা পরবর্তী দশকে আরো বেড়েছে এবং অনেক আবিষ্কারই বিশ্বজগত সৃষ্টির ধারণার পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

জন মেডক্স

অবশ্য কোনো কোনো বস্তুবাদী মনীষী এ-ব্যাপারে তুলনামূলকভাবে যৌক্তিক হতে চেয়েছেন। উদাহরণস্বরূপ, ইংরেজ বস্তুবাদী পদার্থবিদ এইচ পি লিপসন-এর *(H.P.Lipson)* কথা এখানে উল্লেখ করা যায়। এই বিজ্ঞানী, অনিচ্ছা সত্ত্বেও, সৃষ্টিসম্পর্কিত বৈজ্ঞানিক সত্যকে গ্রহণ করে নিয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন: *"আমি মনে করি ... আমাদের অবশ্যই ... স্বীকার করতে হবে যে, সৃষ্টির ধারণা এ-ক্ষেত্রে একমাত্র ধারণা যা গ্রহণ করা যেতে পারে। এটা মেনে নেয়া আমার মতো অন্য পদার্থবিদদের জন্যও কঠিন। কিন্তু গবেষণালব্ধ প্রমাণাদি যখন একে সমর্থন করে, তখন তা স্বীকার না-করে উপায়ই বা কী?" (দেখুন, H.P.Lipson, "A Physicist Looks at Evolution", Physics Bulletin, vol.138, 1980, p.241)।*

www.amarboi.org

মোদ্দাকথা, আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যা চূড়ান্তভাবে যে-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে, তা হচ্ছে: সময় *(time)* ও বস্তুর *(matter)* প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ স্বাধীন থেকে অসীম ক্ষমতাধর একজন স্রষ্টা-ই ও-দুটোকে সৃষ্টি করেছেন। যে অনন্ত শক্তি বিশ্বজগত সৃষ্টি করেছেন, তিনি-ই হলেন আল্লাহ–যিনি অফুরন্ত ক্ষমতা, জ্ঞান ও প্রজ্ঞার অধিকারী।

www.amarboi.org

পদার্থবিজ্ঞান ও জ্যোতির্বিদ্যা: বিশ্বজগত এমনি এমনি সৃষ্টি হয়নি

নিরীশ্বরবাদের পক্ষে আরো একটি প্রচলিত ধারণা কাজ করছিল। ধারণাটি হলো: *এ-পৃথিবীর সব পদার্থ এবং আসমানের সব বস্তু ও গ্রহ-নক্ষত্র হঠাৎ করে এমনি এমনি বা দৈবক্রমে (by chance) সৃষ্টি হয়েছে। এমনকি, বিশ্বজগতে আমরা যে-সব প্রাকৃতিক নিয়ম-কানুন দেখতে পাই, সেগুলো সৃষ্টির পেছনেও কোনো পরিকল্পনা ছিল না, ছিল না কোনো পরিকল্পনাকারীর হাত। ওগুলোও সৃষ্টি হয়েছে দৈবক্রমে।* বলা বাহুল্য, বিংশ শতাব্দীতে বিজ্ঞানের জ্যোতির্বিদ্যা শাখায় আবিষ্কৃত বিভিন্ন সত্য এ-ধারণাকেও নাটকীয়ভাবে বাতিল করে দিয়েছে।

বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে এসে বিজ্ঞানীরা স্বীকার করতে শুরু করলেন যে, বিশ্বজগতে যে প্রাকৃতিক ভারসাম্য বিরাজ করছে, তা মানবজীবনের জন্য অতীব প্রয়োজনীয় এবং এ-ভারসাম্য অত্যন্ত সূক্ষ্মভাবে স্থাপন করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে গবেষণা এগিয়ে চললো এবং একসময় আবিষ্কৃত হলো: বিশ্বজগতের বিভিন্ন ভৌত, রাসায়নিক ও জীববৈজ্ঞানিক নিয়মসমুহ; মাধ্যাকর্ষণশক্তি ও ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিজম; অণুর গঠনশৈলী ইত্যাদি সবকিছুই এমনভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে যেভাবে সৃষ্টি করার ওপর মানবজীবনের অস্তিত্ব নির্ভর করে। এ যেন একটি পরিকল্পিত নকশা! প্রাশ্চাত্যের বিজ্ঞানীরা এ অসাধারণ নকশা বা ডিজাইনের নাম দিয়েছেন 'এ্যানথ্রপিক প্রিন্সিপল' *(anthropic principle)*। সোজা কথায়,

www.amarboi.org

উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে নয়, বরং মানবজীবনকে মাথায় রেখেই বিশ্বজগতের সবকিছু ডিজাইন করা হয়েছে ।

এ বিশ্বজগত যে দৈবক্রমে ও উদ্দেশ্যবিহীনভাবে সৃষ্টি করা হয়নি, বরং পরিকল্পিতভাবে ও সুনির্দিষ্ট উদ্দেশ্য সামনে নিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে, নিম্নলিখিত বৈজ্ঞানিকভাবে প্রমাণিত তথ্যসমুহ সে-কথাই প্রমাণ করে:-

- মহাবিস্ফোরণের (Big Bang) পরমুহূর্ত থেকে বিশ্বজগত সম্প্রসারিত হতে শুরু করেছিল ঠিক সেই গতিতে, যেই গতিতে সম্প্রসারিত হওয়া ছিল অত্যাবশ্যকীয়। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, যদি ওই গতিবেগ কোটি কোটি *(billion billion)* ভাগের একভাগও কমবেশী হতো তবে বিশ্বজগত আজকের অবস্থানে কখনও পৌঁছুতে পারতো না। অন্যভাবে বললে, বিশ্বজগত সৃষ্টির শুরুই হয়েছিল কল্পনাতীত সূক্ষ্ম হিসেব-নিকেশের ওপর ভিত্তি করে।
- বিশ্বজগতে চার ধরণের প্রাকৃতিক শক্তি *(physical forces)* ক্রীয়াশীল আছে। এগুলো হলোঃ মাধ্যাকর্ষণ শক্তি, দূর্বল পারমাণবিক শক্তি, শক্তিশালী পারমাণবিক শক্তি, ও ইলেক্ট্রো-ম্যাগনেটিক শক্তি। বিজ্ঞানীরা হিসেব করে দেখেছেন যে, এই শক্তিগুলো সুশৃঙ্খল বিশ্ব ও সে-বিশ্বে জীবনের অস্তিত্ব লাভের স্বার্থে ঠিকঠিক মাত্রায় বিরাজ করছে। কোনো এক বা একাধিক শক্তির মাত্রা যদি কোটি কোটি কোটি কোটি *(billion billion billion billion)* ভাগের একভাগও কমবেশী হতো তবে বিশ্বজগতে বিচ্ছুরিত রশ্মি *(radiation)* অথবা হাইড্রোজেন গ্যাস ছাড়া আর কিছুই থাকতো না । বলাবাহুল্য, তেমন ধারা এক বিশ্বে প্রাণের অস্তিত্বও থাকতো না বা থাকতে পারতো না ।
- বিশ্বজগতে এমন অনেক সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয় আছে যা পৃথিবীতে প্রাণের অস্তিত্বকে সম্ভব করে তুলেছে। সূর্যের আয়তন এবং

www.amarboi.org

পৃথিবী থেকে এর দূরত্ব ; পানির ভৌত ও রাসায়নিক গুণাগুণ ; সূর্য-রশ্মির তরঙ্গদৈর্ঘ্য *(wave-length)*; পৃথিবীর বায়ুমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের নিখুঁত আনুপাতিক হার; পৃথিবীর চৌম্বকীয় ক্ষেত্র *(magnetic field)*–ইত্যাদি সবকিছু পৃথিবীতে মানুষের জীবনের সহায়ক করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

মোদ্দাকথা, বিশ্বজগতের সর্বত্র বিরাজ করছে এক ধরনের সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম ভারসাম্য। এটি আধুনিক নভোবস্তুবিদ্যার *(astrophysics)* একটি অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কার। বিখ্যাত জ্যোতির্বেত্তা পল ডেভিস *(Paul Davies)* তাঁর দি কসমিক ব্লুপ্রিন্ট *(The Cosmic Blueprint)*-শীর্ষক গ্রন্থের শেষ অনুচছদে লিখেছেন: *"The impression of Design is overwhelming."* অর্থাৎ বিশ্বজগতে একটি পরিকল্পিত ডিজাইনের প্রভাব অপরিসীম।

অন্যদিকে, বিজ্ঞানবিষয়ক জার্নাল নেচার *(Nature)*-এ লিখিত এক নিবন্ধে নভোবস্তুবিজ্ঞানী ডব্লিউ প্রেস *(W. Press)* লিখেছেন: *"...বিশ্বজগতে একটি চমৎকার ডিজাইনের অস্তিত্ব লক্ষ্যণীয়। এ ডিজাইন (পৃথিবীতে) বুদ্ধিমান প্রাণী সৃষ্টির জন্য সম্পূর্ণ সহায়ক।"*

মজার ব্যাপার হচেছ, যে-সব বিজ্ঞানী এ তথ্যসমূহ আবিষ্কার করেছেন, তাঁদের অধিকাংশই বস্তুবাদী চিন্তা-ভাবনা দ্বারা প্রভাবিত ছিলেন এবং অনিচছাসত্ত্বেও এসব তথ্য তুলে ধরতে বাধ্য হয়েছেন। তাঁরা নিশ্চয়ই স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রমাণ করার নিমিত্ত গবেষণা করেন নাই! কিন্তু তাঁদের গবেষণা এবং গবেষণা থেকে প্রাপ্ত ফলাফলই প্রমাণ করছে যে, এ-বিশ্বজগত একটি অনন্য পরিকল্পনার ফসল এবং এর জন্য একজন মহাপরিকল্পনাকারীর অস্তিত্ব থাকাও প্রয়োজন। দা সিমবায়োটিক ইউনিভার্স *(The Symbiotic Universe)*-শীর্ষক গ্রন্থে মার্কিন জ্যোতির্বিজ্ঞানী জর্জ গ্রীনস্টেইন *(George Greenstein)* বলছেন:

www.amarboi.org

"(জীবনের সঙ্গে পদার্থবিদ্যার সূত্রসমূহের সঙ্গতিপূর্ণ সম্পর্কের ব্যাপারটি) কীভাবে ব্যাখ্যা করা চলে?... প্রাপ্ত সম্ভাব্য সকল তথ্য-প্রমাণ বিচার-বিশ্লেষণ করলে তাৎক্ষণিকভাবে মনে হয় যে, কিছু অতিপ্রাকৃতিক এজেন্সী–বা সঠিকভাবে বললে, একটি এজেন্সী–(বিশ্বজগত সৃষ্টির পেছনে) ক্রীয়াশীল আছে। এটা কি সম্ভব যে, ইচ্ছায় নয় বরং হঠাৎ করেই আমরা এমনসব বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণের সম্মুখীন হয়েছি যেগুলো একজন সর্বোচচ সত্তার (Supreme Being) অস্তিত্ব প্রমাণ করে ? আমাদের সুবিধার্থে এ-বিশ্বজগত অত্যন্ত বিচক্ষণতার সঙ্গে সৃষ্টি করেছেন কি তবে **আল্লাহ-ই ?"**

'এটা কি সম্ভব'–শব্দগুচছ ব্যবহার করে গ্রীনস্টেইন–যিনি নিজে একজন নাস্তিক–সহজ সত্যকে উপেক্ষা করতে চেয়েছেন। অবশ্য অনেক বিজ্ঞানী এ-সত্যকে এড়িয়ে যাবার চেষ্টা না-করে বরং উদার মনে স্বীকার করে নিয়েছেন যে, এ-বিশ্বজগত বিশেষভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে মানবজীবনের জন্য। আর তাই আজকাল বস্তুবাদকে একটি ক্রটিপূর্ণ অবৈজ্ঞানিক ধারণা হিসেবে দেখা হয় । আমেরিকার প্রজননবিদ্যা বিশেষজ্ঞ *(geneticist)* রবার্ট গ্রিফিথস *(Robert Griffiths)* এ-সত্যকে মেনে নিয়েছেন। তিনি বলছেন: *"বিতর্কের জন্য আমার যখন একজন নাস্তিকের প্রয়োজন পড়ে তখন আমি দর্শন বিভাগে যাই। পদার্থবিজ্ঞান বিভাগ এ-ক্ষেত্রে আমাকে সাহায্য করে না ।"–(Hugh Ross, The Creator and the Cosmos, পৃষ্ঠা-১২৩)।*

নেচারস ডেস্টিনি: হাও দা লজ অব বায়োলজী রিভিল পারপাস ইন দা ইউনিভার্স *(Nature's Destiny: How the Laws of Biology Reveal Purpose in the Universe)*-শীর্ষক গ্রন্থে বিশ্বখ্যাত মলিকিউলার বায়োলজিষ্ট *(molecular biologist)* মিখায়েল ডেনটন *(Michael Denton)* ভৌত, রাসায়নিক ও জীববিজ্ঞানসংক্রান্ত সূত্রসমূহ আলোচনা করেছেন এবং দেখিয়েছেন কীভাবে এগুলোকে

www.amarboi.org

মানবজীবনের প্রয়োজন মেটানোর উপযোগী করে নিখুঁতভাবে হিসেব-নিকেশ করার পর অস্তিত্বশীল করা হয়েছে। তিনি তাঁর গ্রন্থের একস্থানে লিখেছেন: *"বিগত চার শতাব্দী ধরে বৈজ্ঞানিক পরিমন্ডলে এ-ধারণা প্রচলিত ছিল যে, বিশ্বজগতে জীবন হচেছ একটি প্রান্তস্থ (peripheral) এবং ঘটনাচক্রগত (contingent) জিনিস। বিংশ শতাব্দীর জ্যোতির্বিদ্যা সে-ধারণার প্রতি নাটকীয়ভাবে ছুড়ে দিয়েছে চ্যালেঞ্জ।"*

সংক্ষেপে বললে, উদ্দেশ্যহীন এলোমেলো *(random)* বিশ্বজগতের ধারণা–যা কিনা সম্ভবত নাস্তিকতাবাদের সবচেয়ে শক্তিশালী স্তম্ভ ছিল–ইতিমধ্যে বাতিল হয়ে গেছে। বিজ্ঞানীরা এখন প্রকাশ্যে বস্তুবাদের পতনের কথা বলছেন *(দেখুন, Paul Davies and John Gribbin, The Matter Myth, পৃষ্ঠা-১০)* । আর কুরআন বলছে: *"আমরা আসমান ও জমিন এবং উভয়ের মাঝখানের সবকিছু অকারণে সৃষ্টি করি নাই । অবিশ্বাসীরাই কেবল (অকারণে সৃষ্টির) ধারণা পোষণ করে ..."–(কুরআন, ৩৮:২৭)*। উল্লেখ্য, কুরআনের বক্তব্যের সঙ্গে বিজ্ঞান একমত হয়েছে কুরআন নাজেলের অনেক পরে–বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকে এসে।

www.amarboi.org

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা এবং দৈব জ্ঞানের (divine wisdom) অস্তিত্ব আবিস্কার

কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা আধুনিক বিজ্ঞানের একটি অন্যতম শাখা। এ-শাখায় আবিস্কৃত তথ্য ও তত্ত্বসমূহ্ বস্তুবাদের অসারতা প্রমাণ করে এবং আস্তিকতাবাদের (theism) পক্ষে অবস্থান নেয়।

বস্তুর ক্ষুদ্রতম অংশ নিয়ে কাজ করে কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা । স্কুলের প্রত্যেক শিক্ষার্থী জানে যে, পদার্থ ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র পরমাণু দ্বারা গঠিত। পরমাণু আবার গঠিত একটি নিউক্লিয়াস ও সে-নিউক্লিয়াসকে কেন্দ্র করে ঘূর্ণায়মান কয়েকটি ইলেক্ট্রনের সমন্বয়ে । অবাক হবার মতো তথ্য হচেছ, ওসব উপাদান পরমাণুর মাত্র ০.০০০১ শতাংশ জায়গা দখল করে। অন্যভাবে বললে, প্রতিটি পরমাণুর ৯৯.৯৯৯৯ শতাংশই খালি বা শূণ্য!

ঘটনা এখানেই শেষ নয়। পরমাণুর নিউক্লিয়াস ও ইলেক্ট্রনগুলোকে পরীক্ষা করলে দেখা যাবে, ওগুলো ক্ষুদ্রতর উপাদান দিয়ে গঠিত। বিজ্ঞানীরা সে-উপাদানগুলোর নাম দিয়েছেন 'কোয়ার্ক *(Quarks)*। আর কোয়ার্কগুলো বস্তুর সঠিক অর্থে বস্তু নয়, বরং এগুলো হচেছ 'শক্তি'। এ-আবিষ্কারের ফলে বস্তু ও শক্তির মধ্যে পার্থক্য থাকার যে-ধারণাটি পূর্ব হতে চলে আসছিল, তা অসার বলে প্রমাণিত হলো। এ-আবিষ্কারের ফলে এটাও প্রতীয়মান হয় যে, বস্তুজগতে আসলে শক্তির

www.amarboi.org

উপস্থিতিই সত্য। আরও স্পষ্টভাবে বললে, আমরা যাকে 'বস্তু' বলি সেটি আসলে জমাটবাঁধা *(frozen)* শক্তি ব্যতিত আর কিছু নয়। এক্ষেত্রে ঔৎসুক্য-জাগানো সত্য হচ্ছে: কোয়ার্কগুলো এমনভাবে কাজ করে যা পর্যবেক্ষণ করলে যে-কেউ এগুলোকে চেতনাসম্পন্ন বলে মনে করতে পারে। পদার্থবিজ্ঞানী ফ্রিম্যান ডাইসন *(Freeman Dyson)* টেমপ্লেটন প্রাইজ *(Templeton Prize)* গ্রহণকালে বলেছিলেন: *"পরমাণু বড় রহস্যময় জিনিস। এগুলো নিষ্ক্রিয় বস্তুর মতো নয়, বরং সক্রিয় এজেন্টের মতো আচরণ করে।... মনে হয়, জন্মগতভাবেই ওগুলো একধরনের মন-এর অধিকারী।"–(Gerald Schroeder, The Hidden Face of God, পৃষ্ঠা-৭)।*

সহজ করে বললে, বস্তুর অস্তিত্বের পশ্চাতে কাজ করছে তথ্য। আর তথ্য বস্তুজগত অস্তিত্বশীল হবার পূর্ব থেকেই অস্তিত্বশীল ছিল। এ-বিষয়ে জ্যারাল্ড শ্রোয়েডার বেশকিছু গুরুত্বপূর্ণ মন্তব্য করেছেন। জ্যারাল্ড এমআইটি-তে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত একজন বিজ্ঞানী। তিনি পদার্থবিদ্যা ও জীববিদ্যা–উভয় বিষয় নিয়েই কাজ করেছেন এবং তিনি দ্যা সায়েন্স অব গড *(The Science of God)*-শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থের রচয়িতা। যা হোক, তিনি তার দ্য হিডেন ফেস অব গড: সায়েন্স রিভিলস দ্য আলটিমেট ট্রুথ (২০০১) নামক গ্রন্থে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছেন যে, বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখার মতো কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা হচেছ বস্তুজগতের পেছনে ক্রীয়াশীল বিশ্বজনীন জ্ঞানকে আবিষ্কারের একটি হাতিয়ার। তিনি বলেছেন: *"...বস্তুর ভিত্তি হচেছ শক্তি এবং বস্তু আসলে জমাটবাঁধা শক্তি–এ সত্য আবিষ্কার করতে মানবজাতিকে অপেক্ষা করতে হয়েছে হাজার বছর, অপেক্ষা করতে হয়েছে একজন আইনষ্টাইনের জন্মের। আমরা হয়তো আরও একটু বেশী দেরীতে আবিস্কার করবো যে, শক্তির চেয়েও অধিক মৌলিক কোনো অবস্তু-ই (non-thing) শক্তির ভিত্তি রচনা করেছে...।"–(The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth, পৃষ্ঠা-৮)।*

www.amarboi.org

প্রিন্সটন বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও আইনস্টাইন এওয়ার্ড *(Einstein Award)* বিজয়ী জন আরকিবাল্ড *(John Archibald)* ওই একই সত্যকে ব্যাখ্যা করেছেন একটু অন্যভাবে। তিনি বলেছেন যে, তথ্য থেকেই বস্তুর সার অংশের উদ্ভব ঘটেছে।–*(The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth, পৃষ্ঠা-৮)।*

এদিকে শ্রোয়েডার তার আলোচ্য গ্রন্থের ২৮ পৃষ্ঠায় বলছেন: " *বিজ্ঞান সম্ভবত এমন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে যাচেছ যে, গোটা বিশ্বজগতই তথ্য, জ্ঞান বা একটি ধারণার বহি:প্রকাশ.. ।"* এ-জ্ঞান এমনি এক সর্বজ্ঞ জিনিস *(phenomenon)* যা গোটা বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত। শ্রোয়েডার আরও বলছেন: *"একটি একক সজ্ঞান সত্ত্বা, একটি সর্বজনীন জ্ঞান গোটা বিশ্বজগতে পরিব্যাপ্ত হয়ে আছে। বিজ্ঞানের আবিষ্কারসমূহ ইতিমধ্যেই আমাদেরকে এক বিস্ময়কর সিদ্ধান্তের কাছাকাছি নিয়ে গেছে। সিদ্ধান্তটি হলো : এ বিশ্বজগতে যা কিছু অস্তিত্বশীল আছে, সে সবকিছুই ওই জ্ঞান বা wisdom-এর বহি:প্রকাশ।...পরমাণু থেকে শুরু করে পূর্ণাঙ্গ মানুষ পর্যন্ত প্রতিটি সূক্ষাতিসূক্ষ কণিকা, প্রতিটি সত্তা নির্দিষ্ট মাত্রার তথ্য ও জ্ঞানের প্রতিনিধিত্ব করে বলেই মনে হয়।"–(The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth, পৃষ্ঠা-xi)।*

এ পর্যন্ত যে-আলোচনা করা হলো তা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে যায় যে, বস্তুজগত কিছু বিশৃঙ্খল অণুর সমন্বয়ে গঠিত একটি উদ্দেশ্যহীন জিনিস নয় যেমনটি নিরীশ্বরবাদীরা বা বস্তুবাদীরা ধরে নিয়েছেন। বরং বস্তুজগত এমন জ্ঞানের বহি:প্রকাশ, যা বিশ্বজগত সৃষ্টির পূর্বেও ছিল এবং বিশ্বজগত সৃষ্টির পর এর মধ্যে অস্তিত্বশীল সবকিছুর ওপর ওই জ্ঞানের নিয়ন্ত্রণও নিরঙ্কুশ। শ্রোয়েডারের ভাষায়: *"... যেন একটি মেটাফিজিক্যাল সাবস্ট্রেইট (metaphysical substrate) ফিজিক্যাল সাবস্ট্রেইট-এর আদলে প্রকাশিত হয়েছে।"–(The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth, পৃষ্ঠা-৪৮)।*

www.amarboi.org

বিজ্ঞানের এ-আবিষ্কার বস্তুবাদের গোটা প্রাসাদকে ধুলোয় মিশিয়ে দেয় এবং প্রমাণ করে যে, আমরা যে-বস্তুজগতকে পর্যবেক্ষণ করছি তা এক অতিপ্রাকৃত পরম সত্তার ছায়া *(shadow)* বৈ আর কিছু নয়। এভাবে–যেমনটি শ্রোয়েডার ব্যাখ্যা করেছেন–কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যা এমন এক পয়েন্টে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখানে বিজ্ঞান ও ঈশ্বরতত্ত্ব *(theology)* একে অপরকে সমর্থন করে। শ্রোয়েডার বলছেন: *"বিশ্বজগতের ঈশ্বরতাত্ত্বিক ব্যাখ্যামতে, বিশ্বজগতের সবকিছুই এক অতিপ্রাকৃত জ্ঞানের বহিঃপ্রকাশ... । যদি আমি 'জ্ঞান' শব্দটিকে 'তথ্য' শব্দ দ্বারা প্রতিস্থাপন করি, তবে ঈশ্বরতত্ত্ব ও কোয়ান্টাম পদার্থবিদ্যার মধ্যে তেমন কেনো বিরোধ াকে না । আসলে, আমরা সম্ভবত বস্তুজগতের সঙ্গে আধ্যাত্মিক জগতের বৈজ্ঞানিক মিলন প্রত্যক্ষ করছি।"–(The Hidden Face of God: Science Reveals the Ultimate Truth, পৃষ্ঠা-xii)।*

কোয়ান্টাম হচেছ সেই পয়েন্ট, যে পয়েন্টে সত্য সত্যই ঈশ্বরতত্ত্ব বিজ্ঞানের সঙ্গে মিলেমিশে একাকার হয়ে যায়। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, গোটা বিশ্বজগত যে জ্ঞান দ্বারা পরিবৃত–এ-সত্যটি চৌদ্দশ বছর পূর্বেই আল-কুরআনে প্রকাশ করা হয়েছে। কুরআনে বলা হয়েছে: *"তোমাদের ইলাহ তো কেবল আল্লাহ্ই, যিনি ব্যতীত অন্য কোনো ইলাহ নাই। তাঁহার জ্ঞান সর্ববিষয়ে ব্যাপ্ত।"–(কুরআন, ২০: ৯৮)।*

www.amarboi.org

প্রাকৃতিক বিজ্ঞান: ডারউইনবাদের পতন

যেমনটি এ-নিবন্ধের শুরুতে উল্লেখ করেছি, নিরীশ্বরবাদের উত্থানের পেছনে ক্রিয়াশীল ফ্যাক্টরগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রচারিত ডারউইনের বিবর্তন তত্ত্ব *(theory of evolution)*। মানুষ থেকে শুরু করে সব জীবিত বস্তুর উৎপত্তি হয়েছে অচেতন বস্তু থেকে সম্পূর্ণ অপরিকল্পিতভাবে–ডারউইনবাদের এ-সাক্ষ্য নিরীশ্ববরবাদীদের সে-সুযোগ এনে দিয়েছিল, যা তাঁরা শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে খুঁজে বেড়াচ্ছিলেন। অতএব তাঁরা ডারউইনবাদকে বিনা বাক্য ব্যয়ে মেনে নিলেন এবং মার্কস ও এ্যাঙ্গেলসের মতো নাস্তিক চিন্তাবিদরা তাঁদের দর্শনের ভিত্তি হিসেবে গ্রহণ করলেন এ-তত্ত্বকে। সে থেকেই ডারউইনবাদের সঙ্গে নিরীশ্বরবাদের সখ্যতা। কিন্তু বিংশ শতাব্দীতে এসে, নিরীশ্বরবাদের অন্যতম সমর্থক এই ডারউইনবাদ তীব্র বিরোধিতার সম্মুখীন হয়। আর সে-বিরোধিতা আসে খোদ বিজ্ঞানের তরফ থেকে। জীবাশ্ম বিজ্ঞান *(paleontology)*, প্রাণরসায়ন *(biochemistry)*, অঙ্গব্যবচ্ছেদবিদ্যা *(anatomy)*, ও বংশগতিবিদ্যার *(genetics)* মতো বিজ্ঞানের বিভিন্ন শাখায় আবিস্কৃত

ডারউইন

www.amarboi.org

তত্ত্ব ও সত্য ডারউইনবাদের ভিতকে দেয় গুড়িয়ে। আমরা বিষয়টি নিয়ে আমাদের অন্যান্য গ্রন্থ ও প্রকাশনায় বিস্তারিত আলোচনা করেছি। এখানে আলোচনা করছি সংক্ষেপে:

● **জীবাশ্ম বিজ্ঞান** *(Paleontology)*: ডারউইনের তত্ত্ব একটি অনুমানের উপর ভিত্তি করে রচিত। অনুমানটি হলো: পৃথিবীর সব প্রাণী সৃষ্টি হয়েছে একটি একক *(single)* ও সাধারণ *(common)* পূর্বপুরুষ *(ancestor)* থেকে, দীর্ঘকাল ধরে ছোট ছোট পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে। ডারউইন ধরে নিয়েছিলেন, ফসিল বা জীবাশ্মের রেকর্ড আবিষ্কারের মাধ্যমে তাঁর তত্ত্বের সঠিকতা প্রমাণিত হবে। কিন্তু বিংশ শতাব্দীর জীবাশ্ম গবেষণার ফলাফল গেল ডারউইনবাদের বিরুদ্ধেই । এক প্রজাতি থেকে বিবর্তনের মাধ্যমে অন্য প্রজাতির উৎপত্তি লাভের অর্থ মধ্যবর্তী কোনো প্রজাতির অস্তিত্ব থাকা। আর যেহেতু বর্তমান বিশ্বে অসংখ্য প্রাণী আছে, সেহেতু অতীতে অসংখ্য মধ্যবর্তী প্রজাতির *(intermediate species)* অস্তিত্ব ছিল বলে ধরে নিতে হয় । ডারউইন এ-ধরণের মধ্যবর্তী প্রজাতির জীবাশ্ম আবিষ্কারের আশায় ছিলেন। কিন্তু বাস্তবে দেখা গেল, তেমন একটি প্রজাতির জীবাশ্মও আবিষ্কৃত হলো না । আবিস্কৃত বিভিন্ন ফসিল বা জীবাশ্ম রেকর্ড থেকে বরং এটা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, সব প্রজাতি হঠাৎ করে পূর্ণাঙ্গ আকৃতি নিয়েই আবির্ভূত হয়েছে–বিবর্তনের মাধ্যমে ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে পূর্ণাঙ্গ রুপ পায়নি। এ-ক্ষেত্রে ক্যামব্রিয়ান এক্সপ্লোশান *(Cambrian Explosion)*-এর কথা উল্লেখ করা যায়। ওই আদি ভূ-তাত্ত্বিক সময়ে *(geological period)* প্রাণীরাজ্যের প্রায় সকল প্রাণী হঠাৎ করেই স্ব স্ব পূর্ণাঙ্গ রূপ নিয়ে অস্তিত্ব লাভ করেছিল বলে জীবাশ্ম বিজ্ঞান সাক্ষ্য দেয়। হঠাৎ করে সম্পূর্ণ ভিন্ন দৈহিক গঠন ও ভিন্ন ভিন্ন জটিল অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে অসংখ্য প্রজাতির একই সঙ্গে অস্তিত্বলাভের ঘটনা ডারউইনবাদের অসারতা প্রমাণ করে। কারণ, কোনো কোনো বিবর্তনবাদীও স্বীকার করেছেন যে, প্রাণীরাজ্যে একসঙ্গে অসংখ্য ভিন্ন ভিন্ন প্রজাতির আবির্ভাবের ঘটনা ইঙ্গিত করে একটি

www.amarboi.org

অতিপ্রাকৃত *(supernatural)* ডিজাইনের প্রতি–যে-ডিজাইন অনুসারে পৃথিবীর সকল প্রাণী সৃষ্টি করা হয়েছে।

● **জীববিজ্ঞানসংশ্লিষ্ট পর্যবেক্ষণসমূহ** *(Biological Observations)*: ডারউইনের সময়ে নির্দিষ্ট পদ্ধতি অবলম্বন করে ভিন্ন ভিন্ন বৈশিষ্ট্যের কুকুর ও ঘোড়া উৎপাদনের কয়েকটি ঘটনা ঘটেছিল। তিনি তাঁর তত্ত্ব ব্যাখ্যা করতে গিয়ে সেসব উদাহরণের ওপর নির্ভর করতে দ্বিধা করেননি। তিনি বিশেষ পদ্ধতিতে উৎপাদিত ওই কুকুর ও ঘোড়ার আকার-আকৃতিতে সামান্য পরিবর্তন লক্ষ্য করেন এবং দাবী করে বসেন যে, ওই একইভাবে প্রাণীজগতের প্রতিটি প্রজাতির উৎপত্তি একটি একক ও সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে হয়ে থাকবে। কিন্তু বাস্তবতা হচেছ, ডারউইন উনবিংশ শতাব্দীতে বসে ওই দাবী করছিলেন এবং বিজ্ঞান তখন তেমন উন্নত ছিল না। বিংশ শতাব্দীতে এসে বিজ্ঞান উন্নত হলো এবং পূর্বের অনেক ধারণা-অনুমান প্রমাণিত হলো মিথ্যা বলে। এ-শতাব্দীতে দশকের পর দশক বিভিন্ন প্রজাতির ওপর পর্যবেক্ষণ ও গবেষণার কাজ করার পর বিজ্ঞানীরা এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন যে, প্রাকৃতিক বা কৃত্রিমভাবে কোনো প্রজাতির দৈহিক গঠনে খানিকটা পরিবর্তন ঘটা সম্ভব হলেও, সে-পরিবর্তন কোনো অবস্থাতেই নির্দিষ্ট বংশগতি সীমানা *(genetic boundary)* অতিক্রম করে না। ডারউইন তাঁর The Origin of Species: A Facsimile of the First Edition-শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, ভালুকের একটি নির্দিষ্ট প্রজাতি প্রাকৃতিক নির্বাচনের মাধ্যমে বিবর্তিত হতে হতে তিমি মাছের মতো একটি দৈত্যাকার প্রাণীর রূপ পরিগ্রহ করেছে বলে ধরে নেয়ার মাঝে তিনি কোনো সমস্যা দেখেন না। বস্তুত, ওটি ছিল ডারউইনের অজ্ঞতাপ্রসূত মন্তব্য *(বিংশ শতাব্দীতে আবিস্কৃত সংশ্লিষ্ট বৈজ্ঞানিক সত্যসমূহ সম্পর্কে অবগত থাকলে হয়তো তিনি মন্তব্যটি করতেন না)*। আজকাল নব্য-ডারউইনবাদীরা *(Neo-Darwinist)* মিউটেশন *(mutations)* বা জিনগত বিশৃঙ্খলাকে বিবর্তনের মেকানিজম হিসেবে চালিয়ে দিতে চাচেছন। কিন্তু আধুনিক বিজ্ঞান

www.amarboi.org

সে-দাবীকেও অগ্রহণযোগ্য বলে রায় দিয়েছে।

● **প্রাণের উৎপত্তি** *(The Origin of Life)*: ডারউইন একটি একক ও সাধারণ পূর্বপুরুষ থেকে বিশ্বের তাবৎ প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে বলে দাবী করেছেন। কিন্তু তিনি ওই একক ও সাধারণ পূর্বপুরুষের উৎপত্তি কীভাবে হয়েছে তা বলেননি। অন্যভাবে বললে, তিনি পৃথিবীতে প্রথম প্রাণের উন্মেষ কীভাবে ঘটেছে সে-ব্যাখ্যা দেননি। ডারউইন অবশ্য Life and Letter of Charles Darwin-শীর্ষক গ্রন্থে বলেছেন যে, পৃথিবীতে প্রথম জীবকোষটি কোনো এক ছোট্ট উষ্ণ জলাশয়ে এলোমেলো *(random)* রাসায়নিক বিক্রিয়ার ফলে উৎপন্ন হয়ে থাকতে পারে। কিন্তু পরবর্তী কালে সব ধরণের গবেষণা ও পর্যবেক্ষণ থেকে এটা প্রমাণিত হয়েছে যে, সংশ্লিষ্ট উপাদানগুলোর মধ্যে এলোমেলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে আদি জীবকোষ সৃষ্টির ধারণা একটি অসম্ভব ও অবাস্তব ফেনোমেনন *(phenomenon)* বৈ আর কিছু নয়। বিখ্যাত বিজ্ঞানবিষয়ক ম্যাগাজিন Nature-এ *(১৯৮১ সালের ১২ নভেম্বর প্রকাশিত সংখ্যায়)* নোবেল বিজয়ী নিরীশ্বরবাদী ইংরেজ বিজ্ঞানী Fred Hoyle এলোমেলো রাসায়নিক বিক্রিয়ার মাধ্যমে হঠাৎ করে জীবকোষ উৎপত্তির সম্ভাবনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে বলেছেন: *"একটি টর্নেডোর ধাক্কায় হঠাৎ করে প্রয়োজনীয় উপাদানসমূহ একত্রিত হয়ে একটি বোয়িং-৭৪৭ তৈরী হয়ে যাবার সম্ভাবনা যতটুকু, আলোচ্য উপায়ে জীবকোষ সৃষ্টির সম্ভাবনাও ঠিক ততটুকু।"*

● **ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন** *(Intelligent Design)*: বিজ্ঞানীরা জীবকোষ নিয়ে গবেষণা করেছেন, গবেষণা করেছেন সে-সব উপাদান নিয়ে যে-সব উপাদানে জীবকোষ গঠিত। জীবদেহের বিভিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ এবং সেগুলোর বিচিত্র ও অনন্যসাধারণ গঠনশৈলী নিয়েও তাঁরা গবেষণা করেছেন। এ-সব গবেষণা থেকে যে-সত্যটি বেরিয়ে এসেছে তা হলো: জীবজগতের প্রতিটি প্রজাতি সৃষ্টি করা হয়েছে এমন

www.amarboi.org

জটিল নকশার ভিত্তিতে যা মানুষের তৈরী কোনো কৃত্রিম যন্ত্রে পাওয়া সম্ভব নয়। সৃষ্টিজগত যে একটি নিখুঁত ডিজাইন অনুসারে অস্তিত্বশীল করা হয়েছে তা উপলব্ধি করার জন্য সৃষ্টিজগতের অসংখ্য আশ্চর্য সৃষ্টির মধ্যে মাত্র দু-একটা সৃষ্টি নিয়ে চিন্তা করা-ই যথেষ্টঃ যেমন–আমাদের চোখ এত উন্নত করে সৃষ্টি করা হয়েছে যা কোনো ক্যামেরার সঙ্গে-ই তুলনীয় নয়; নিখুঁতভাবে ডিজাইন-করা পাখির ডানা দেখে মানুষ আকাশে ওড়ার যন্ত্র আবিষ্কারে উদ্বুদ্ধ হয়েছিল; প্রতিটি জীবকোষের ডিএনএ *(DNA)*-তে এতো বিপুল তথ্য রেখে দেয়া হয়েছে যা কেবল একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধিনে একজন পরিকল্পনাকারীই রাখতে পারেন। ক্যামেরা, উড়োজাহাজ, বা কম্পিউটার–সবকিছুই তৈরী করা হয়েছে বহু সাধ্য-সাধনার পর, নির্দিষ্ট ডিজাইন অনুসারে। এটা কী করে সম্ভব যে, যে-কোনো উন্নত ক্যামেরার চেয়ে উন্নততর চোখ সৃষ্টির ব্যাপারটি হঠাৎ করে এমনি এমনি বা দৈবক্রমে *(by chance)* ঘটে গেছে! অথচ বিবর্তনবাদ বলে, পৃথিবীতে অমন অসংখ্য অত্যাশ্চর্য অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ নিয়ে অসংখ্য প্রাণীর সৃষ্টি হয়েছে এমনি এমনি!! বৈজ্ঞানিকভাবে আবিষ্কৃত বিভিন্ন তথ্য অবশ্য ইতিমধ্যেই প্রমাণ করেছে যে, জীবজগত এক অনন্যসাধারণ ডিজাইন অনুসারে পরিকল্পিতভাবেই সৃষ্টি করা হয়েছে।

এভাবেই বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আবিষ্কৃত অকাট্য সত্যের মোকাবিলায় বিংশ শতাব্দীর শেষ দিকে এসে একেবারে কোনঠাসা হয়ে পড়ে ডারউইনবাদ। আজকাল যুক্তরাষ্ট্রসহ পশ্চিমের বিভিন্ন দেশের বিজ্ঞানীদের মধ্যে ক্রমবর্ধমান হারে গ্রহণযোগ্যতা পাচ্ছে ইন্টেলিজেন্ট ডিজাইন তত্ত্ব *(theory of intelligent design)*। যারা এ-তত্ত্ব মেনে নিয়েছেন এবং নিচ্ছেন, তাঁরা বলছেন: বিজ্ঞানের ইতিহাসে ডারউইনবাদ একটি বড় ভুল *(great error)* বৈ আর কিছু নয়। বস্তুত, বৈজ্ঞানিক সত্য ও তত্ত্ব সবার চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিচ্ছে যে, প্রতিটি জীবিতবস্তুকে অস্তিত্বে আনা হয়েছে সুনির্দিষ্ট নকশা বা ডিজাইন অনুসারে। আর ডিজাইন যখন আছে, তখন একজন ডিজাইনারের অস্তিত্ব অস্বীকার

www.amarboi.org

করা চলে না। বৈজ্ঞানিকভাবে আবিস্কৃত বিভিন্ন তথ্য প্রকারান্তরে সে-ডিজাইনারের অস্তিত্বকে মেনে নিতে বিবেকবান মানুষকে বাধ্য করে, বাধ্য করে সকল জীবিতবস্তুর ডিজাইনার ও স্রষ্টা হিসেবে এক অতিপ্রাকৃত সত্ত্বা তথা আল্লাহ্-কে মেনে নিতে।

www.amarboi.org

মনোবিজ্ঞান :
ফ্রয়েডবাদের পতন
এবং
ধর্মের গ্রহণযোগ্যতা অর্জন

উনবিংশ শতাব্দীতে মনোবিজ্ঞান শাখায় নিরীশ্বরবাদের প্রতিনিধিত্ব করছিলেন অস্ট্রিয়ান সাইকিয়াট্রিস্ট *(মানসিক রোগের চিকিৎসক)* সিগমান্ড ফ্রয়েড *(Sigmund Freud)*। তিনি একটি মনোবৈজ্ঞানিক তত্ত্ব প্রস্তাব করেছিলেন। তত্ত্বটি আত্মার অস্তিত্ব অস্বীকার করে এবং মানবজাতির গোটা আধ্যাত্মিক জগতকে যৌনতা ও ভোগের দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করে। তবে ফ্রয়েডের আক্রমণের মূল লক্ষ্যবস্তু ছিল ধর্ম।

সিগমান্ড ফ্রয়েড

১৯২৭ সালে প্রকাশিত হয় তার দ্যা ফিউচার অব এন ইলিউশন *(The Future of an Illusion)* নামক গ্রন্থ। ওই গ্রন্থে তিনি দাবী করেন যে, ধর্মীয় বিশ্বাস একধরনের মানসিক অসুস্থতা এবং মানবজাতির অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে ধর্মীয় বিশ্বাসও একসময় বিলুপ্ত হয়ে যাবে। ফ্রয়েড যখন দাবীটি করেন তখন বিজ্ঞান তেমন উন্নত ছিল না। স্বাভাবিকভাবেই,

www.amarboi.org

ফ্রয়েড পর্যাপ্ত গবেষণা না-করেই এবং প্রয়োজনীয় তথ্য-প্রমাণ ব্যতিরেকেই তাঁর তত্ত্ব উপস্থাপন করতে দ্বিধা করেননি। ফলে তার তত্ত্বটি ছিল ত্রুটিপূর্ণ। অনুমান করি, যদি ফ্রয়েড আধুনিক জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোকে তাঁর তত্ত্ব যাচাই করার সুযোগ পেতেন তবে নিজেই নিজের তত্ত্বের দূর্বলতা ধরতে পেরে অবাক হতেন এবং নিজেই এর সমালোচনায় মুখর হয়ে উঠতেন।

ফ্রয়েডের পর মনোবিজ্ঞান এগিয়ে চলছিল নিরীশ্বরবাদের ছত্রচ্ছায়ায়। শুধু ফ্রয়েড নন, মনোবিজ্ঞানের অন্যান্য স্কুলের *(schools of psychology)* প্রতিষ্ঠাতারাও *(বিংশ শতাব্দীর)* ছিলেন নাস্তিক বা নিরীশ্বরবাদী। তেমনি দু'জন মনোবিজ্ঞানী হলেনঃ আচরণবাদী স্কুলের *(behaviourist school)* প্রতিষ্ঠাতা বি এফ স্কিনার *(B F Skinner)* ও র‍্যাশনাল ইমোটিভ থেরাপির *(rational emotive therapy)* প্রতিষ্ঠাতা এলবার্ট এলিস *(Albert Ellis)*। এ-সময় মনোবিজ্ঞানের জগত নিরীশ্বরবাদের ফোরামে পরিণত হয়। ১৯৭২ সালে আমেরিকান সাইকোলজি এসোসিয়েশন-এর সদস্যদের মধ্যে একটি জরিপ চালানো হয়েছিল। জরিপের ফলাফলে দেখা যায়, যুক্তরাষ্ট্রের মনোবিজ্ঞানীদের মধ্যে মাত্র ১.১ শতাংশ আস্তিক, বাকি সবাই নাস্তিক।

কিন্তু অধিকাংশ মনোবিজ্ঞানী–যারা ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের জালে জড়িয়ে পড়েছিলেন–নিজেদের দ্বারা কৃত মনোবৈজ্ঞানিক গবেষণার ফলাফল থেকেই জানতে পেরেছিলেন যে, ফ্রয়েডের তত্ত্ব কতটা ত্রুটিপূর্ণ! তাদের গবেষণা থেকেই জানা গেল, ফ্রয়েডিয় তত্ত্বের ভিত্তি খুবই দূর্বল এবং বলতে গেলে এ-তত্ত্বের কোনো বৈজ্ঞানিক ভিত্তি-ই নেই!! গবেষণা থেকে আরও প্রমাণিত হয়ঃ ধর্ম তো মানসিক রোগ নয়ই, বরং মানসিক স্বাস্থ্যের মূল উপাদান। আমেরিকান লেখক পেট্রিক গ্লাইন *(Patrick Glynn)* তাঁর God: The Evidence, The Reconcilliation of Faith and Reason in a Postsecular World নামক গ্রন্থে লিখেছেনঃ *"(ধর্মের*

www.amarboi.org

প্রতি) মনোবিশ্লেষণাত্মক দৃষ্টিভঙ্গির (psychoanalytic vision) প্রতি বিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশ খুব সদয় ছিল না । এ-সময় প্রমাণিত হয়ে যায় যে, ধর্মের প্রতি ফ্রয়েডিয় দৃষ্টিভঙ্গি সম্পূর্ণ প্রতারণাপূর্ন। বিংশ শতাব্দীর শেষ চতুর্থাংশে অর্থাৎ বিগত ২৫ বছরে মনোবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে যে-গবেষণা হয়েছে তা আমাদের চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছে যে, ধর্ম মানসিক রোগ বা মানসিক রোগের উৎস–যেমনটি ফ্রয়েড ও তার অনুসারীরা দাবী করেছেন–তো নয়ই, বরং ধর্ম মানুষের মানসিক স্বাস্থ্য ও সুখের জন্য প্রয়োজনীয় উপাদানগুলোর অন্যতম। গবেষণার পর গবেষণা থেকে এটা স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে, যারা ধর্মে বিশ্বাস করে এবং ধর্মচর্চা করে তাঁরা আত্মহত্যা, পানাভ্যাস, মাদকাসক্তি, তালাক, বিষন্নতা ইত্যাদি সামাজিক সমস্যাগুলোর মোকাবিলায় অধিকতর গ্রহণযোগ্য ও স্বাস্থ্যকর সিদ্বান্ত গ্রহন করে তা বাস্তবায়ন করতে পারে। দাম্পত্য-জীবনে তৃপ্তি পাওয়ার প্রধান শর্তও যে ধর্মবিশ্বাস ও ধর্মচর্চা–এ-সত্যটিও বেরিয়ে এসেছে ওসব গবেষণা থেকে।"

সবশেষে, যেমনটি গ্লাইন বলেছেন *(তাঁর ওই গ্রন্থে),*' বিংশ শতাব্দীর শেষ প্রান্তে এসে মনে হচেছ, আধুনিক মনোবিজ্ঞান ধর্মের সাথে নতুন প্রেক্ষাপটে, নতুন করে, বোঝাপড়া করছে' এবং 'প্রমাণিত হয়েছে যে, মানুষের মানসিক স্বাস্থ্যের ব্যাপারে নিখাঁদ বস্তুবাদী (secular) দৃষ্টিভঙ্গি শুধু তাত্ত্বিকভাবে নয়, ব্যবহারিক ক্ষেত্রেও ব্যর্থ" ।

অন্যভাবে বললে, মনোবিজ্ঞানের জগতেও নিরীশ্বরবাদের ঘটেছে বড় ধরণের পরাজয়।

www.amarboi.org

চিকিৎসাবিদ্যা :
"শান্তি কোথায় মিলবে ?"–এ-প্রশ্নের উত্তর আবিষ্কার

National Institute for Healthcare Research-এর ডেভিড বি লারসন *(David B. Larson)* ও তাঁর সঙ্গীদের দ্বারা পরিচালিত একটি জরিপ থেকে বেরিয়ে এসেছিল আগ্রহ-উদ্দীপক তথ্য। তাঁরা দেখতে পান, যারা নিয়মিত চার্চে যাতায়াত করেন, তাদের আর্টেরিওস্কেলেরোটিক *(arteriosclerotic)* হৃদরোগ হবার সম্ভাবনা, যারা অনিয়মিত চার্চে যাতায়াত করেন তাদের তুলনায় মাত্র ষাট শতাংশ। অন্যদিকে, নিয়মিত চার্চে যাতায়াতকারী মেয়েদের মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সেসব মেয়ের তুলনায় অর্ধেক যারা নিয়মিত চার্চে যাতায়াত করেন না। লারসন ও তাঁর সঙ্গীরা ওই জরিপ থেকে আরও আবিষ্কার করেন যে, যেসব ধূমপায়ী নিজেদের জীবনে ধর্মকে খুব বেশী গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন না, তাদের নরমাল ডায়াস্টলিক প্রেসার রিডিং *(normal diastolic pressure readings)* থাকার সম্ভাবনা সেসব ধূমপায়ীর তুলনায় সাতগুণেরও কম যেসব ধূমপায়ী ধর্মকে নিজেদের জীবনে খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে করেন।–*(দেখুন, Patrick Glynn, God: The Evidence... পৃষ্ঠা–৮০-৮১)।*

প্রশ্ন হচ্ছে: কেন এমন হয়? বস্তুবাদী মনোবিজ্ঞানীরা একে সাধারণভাবে ব্যাখ্যা করবেন "মনোবৈজ্ঞানিক কারণ" *(psychological*

www.amarboi.org

cause) হিসেবে। এ-ধরণের ব্যাখ্যানুসারে *(স্রষ্টায়)* বিশ্বাস মানুষের মনোবল বৃদ্ধি করে এবং এর ফলে সে মনোদৈহিক সুবিধা লাভ করে। এ-ব্যাখ্যায় হয়তো খানিকটা সত্য আছে, তবে আমরা বিষয়টার একটু গভীরে তাকালেই আরও অধিক নাটকীয় কিছু দেখতে পাবো । আসলে, স্রষ্টায় বিশ্বাস মানুষের মনোবল বৃদ্ধিতে যতটা প্রভাব ফেলতে পারে, অন্য কোনো জিনিস ততটা পারে না। ধর্মীয় বিশ্বাস ও দৈহিক স্বাস্থ্যের মধ্যে সম্পর্ক নিরূপণের লক্ষ্যে গবেষণা করে Harvard Medical School-এর Dr. Herbert Benson কিছু আগ্রহ-উদ্দীপক ফলাফল পেয়েছেন। বেনসন কোনো ধর্মে বিশ্বাসী ছিলেন না। কিন্তু তিনি গবেষণায় প্রমাণ পান যে, স্রষ্টায় বিশ্বাস ও প্রার্থনা মানুষের স্বাস্থ্যের ওপর যতটা ইতিবাচক প্রভাব ফেলে, ততটা ইতিবাচক প্রভাব অন্য কোনো কিছুই ফেলতে পারে না । তিনি বলছেন: *(গবেষণা করে আমি এ-সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে) স্রষ্টায় বিশ্বাস মানুষের মনকে যতটা প্রশান্ত করে, ততটা প্রশান্ত অন্য কোনো ধরণের বিশ্বাস করতে পারে না।"–(দেখুন, Herbert Benson ও Mark Stark-এর লেখা গ্রন্থ Timeless Healing, পৃষ্ঠা ২০৩)।*

মানুষের মন ও দেহের সঙ্গে স্রষ্টার প্রতি বিশ্বাসের এই বিশেষ সম্পর্ক কেন? আগেই বলেছি, হার্বার্ট বস্তুবাদী গবেষক ছিলেন। অথচ তিনিই এই প্রশ্নের জবাবে বলছেন: মানুষের মন ও দেহকে স্রষ্টার জন্যই একসূত্রে বাধা হয়েছে। *(দেখুন, Timeless Healing, পৃষ্ঠা- ১৯৩)।*

এ সত্য–যা চিকিৎসাজগত ধীরে ধীরে বুঝতে শুরু করেছে–কুরআনে প্রকাশ করা হয়েছে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে। কুরআন বলছে: " *আল্লাহ তথা স্রষ্টার স্মরণেই কেবল অন্তর শান্তি পেতে পারে।"–(কুরআন, ১৩: ২৮)*। যাঁরা স্রষ্টায় বিশ্বাস করেন; তাঁর উপর আস্থা রাখেন এবং তাঁর কাছে নিজেদের প্রয়োজন মেটানোর জন্য প্রার্থনা করেন–তাঁরা দৈহিক ও মানসিক দিক দিয়ে অন্যদের তুলনায় অধিকতর স্বাস্থ্যবান হন। কেন হন? কারণ ওসব করবার মাধ্যমে তাঁরা তাদের

www.amarboi.org

প্রকৃতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ আচরণ করেন। বলাবাহুল্য, মানুষের প্রকৃতির সঙ্গে সাংঘর্ষিক যে-কোনো দার্শনিক ব্যবস্থা সবসময়ই মানুষের জন্য যন্ত্রনা, দুঃখ, দুশ্চিন্তা ও বিষন্নতা বয়ে আনে।

একজন ধার্মিক ব্যক্তির মনে শান্তি বিরাজ করেন। এ-শান্তির উৎস হলেন স্রষ্টা নিজে। আর ধার্মিক ব্যাক্তি স্রষ্টার সন্তুষ্টির জন্যই কাজ করেন। অন্যভাবে বললে, ধার্মিক ব্যক্তি বিবেকের ডাক শোনার পুরষ্কার হিসেবে লাভ করেন ওই শান্তি। এখানে বলে রাখা ভাল যে, একজন ধার্মিক লোক কেবল শান্তির জন্য বা ভাল স্বাস্থ্যের আশায় ধর্মীয় জীবন যাপন করেন না। কেবল এ-ধরনের ইচছা মনে পোষণ করে ধর্ম-কর্ম করলে কেউ সঠিক অর্থে শান্তি পেতে পারে না । স্রষ্টা জানেন একজন কী প্রকাশ করে বা মনের গভীরে কী গোপন করে। স্রষ্টার প্রতি নিবেদিতপ্রাণ হয়ে এবং তাঁর সন্তুষ্টি অর্জনের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে ধর্মীয় বিধি-বিধান পালনের মাধ্যমেই কেবল একজন প্রকৃত শান্তি পেতে পারে। স্রষ্টা বলছেন: *"তুমি একনিষ্ঠ হইয়া নিজেকে ধর্মে বা দীনে প্রতিষ্ঠিত কর। আল্লাহর প্রকৃতির অনুসরণ কর, যে-প্রকৃতি অনুযায়ী তিনি মানুষ সৃষ্টি করিয়াছেন; আল্লাহর সৃষ্টির কোনো পরিবর্তন নাই। ইহাই সরল ধর্ম, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।"-(কুরআন, ৩০: ৩০)।*

বিভিন্ন আবিষ্কারের আলোকে আমরা সংক্ষেপে ওপরে যে-সত্য তুলে ধরলাম, আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যা সে-সত্যকে স্বীকার করতে শুরু করেছে। পেট্রিক গ্লাইন বলছেন: *"সাম্প্রতিককালের চিকিৎসাবিদ্যা (medicine) স্পষ্টতই নিখাঁদ বস্তুগত (meterial) চিকিৎসার বাইরেও যে চিকিৎসা পদ্ধতি থাকতে পারে তা স্বীকার করতে যাচ্ছে।"-(Patrick Glynn, God: The Evidence...পৃষ্ঠা-৯৪)।*

www.amarboi.org

সমাজ : সাম্যবাদ, ফ্যাসিবাদ ও হিপ্পিবাদের পতন

বিংশ শতাব্দীতে এসে নিরীশ্বরবাদ শুধু নভোবস্তুবিদ্যা *(astrophysics)*, জীববিদ্যা, মনোবিজ্ঞান ও চিকিৎসাবিজ্ঞানের দ্বারা অসার প্রমাণিত হয়েছে তা-ই নয়; এ-সময়ের রাজনীতি ও সামাজিক নৈতিকতার ক্ষেত্রেও এ-মতবাদের ঘটেছে বড় ধরণের পরাজয়।

কমিউনিজমকে আখ্যায়িত করা যেতে পারে ঊনবিংশ শতাব্দীর নিরীশ্বরবাদের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক ফল হিসেবে। মার্কস্, এ্যাঙ্গেল্স, লেলিন, ট্রটস্কি বা মাও—কমিউনিজমের সব দিকপালই নিরীশ্বরবাদকে মূলনীতি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। আর তাই, সব কমিউনিস্ট শাসকের প্রাথমিক লক্ষ্য ছিল সমাজে নাস্তিকতাবাদ বা নিরীশ্বরবাদকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং অন্য সবধরণের ধর্মবিশ্বাসকে ধ্বংস করে দেয়া। স্ট্যালিনের রাশিয়া, রেড চায়না, ক্যাম্বোডিয়া, আলবেনিয়া, এবং পূর্ব ব্লকের কিছু দেশে সে-লক্ষ্য অর্জনের জন্য ধার্মিক লোকদের ওপর অমানুষিক নির্যাতন চালানো হয়েছিল; সে-নির্যাতন কখনো কখনো রূপ নিয়েছিল গণহত্যায়।

এতকিছুর পরও, আশ্চর্যজনকভাবে, ঊনবিংশ শতাব্দীর আশির দশকে এসে কমিউনিজমের পতন ঘটলো। কমিউনিজমের পতনের

www.amarboi.org

কারণগুলো বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে যে, এ-সময়ে কমিউনিজমের আবরণে আসলে পতন ঘটেছে নিরীশ্বরবাদের। প্যাট্রিক গ্লাইন লিখেছেন: *"বস্তুবাদী ঐতিহাসিকরা নিশ্চিতভাবেই বলবেন যে, অর্থনীতির সূত্রগুলোকে অস্বীকার করার চেষ্টা-ই ছিল কমিউনিজমের সবচে বড় ভুল। আসলে সমস্যা ছিল আরো...। কমিউনিজমের পতনের কারণগুলো খুঁজতে গেলে ঐতিহাসিকদের কাছে এটা আরো স্পষ্ট হবে যে, সোভিয়েত অভিজাতশ্রেণী নিরীশ্বরবাদী 'বিশ্বাসের সংকটে' ভুগছিল। একটি নিরীশ্বরবাদী আদর্শের অধীনে বাস করে–যে আদর্শ অনেকগুলো মিথ্যার ওপরে এবং ওই মিথ্যাগুলো একটি 'বড়' মিথ্যার ওপরে ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত ছিল–সোভিয়েত সমাজব্যবস্থা সকল অর্থেই নীতিভ্রষ্টতা ও আত্মবিশ্বাসহীনতায় ভুগছিল। (দেশটির) জনগণ–শাসকগোষ্ঠীসহ–হারিয়ে বসেছিল সবধরণের নীতি-নৈতিকতার ধারণা এবং আশা।"–(দেখুন, Patrick Glynn; God: The Evidence, The Reconcilliation of Faith and Reason in a Postsecular World; পৃষ্ঠা- ১৬১-১৬২)।*

সোভিয়েত-সিস্টেম যে বড় ধরণের 'বিশ্বাসের সংকটে' ভুগছিল, তার আগ্রহ-উদ্দীপক ইঙ্গিত হচ্ছে প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভের সংস্কার-প্রচেষ্টা। প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণের পর থেকেই গর্বাচেভ অর্থনৈতিক সংস্কার কার্যক্রমের পাশাপাশি নৈতিক সমস্যাবলী সমাধানের ব্যাপারেও আগ্রহী ছিলেন। উদাহরণস্বরূপ, তিনি মদ্যপানের বিরুদ্ধে জনমত গঠনে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন। তবে, সমাজের নৈতিক মনোবল বৃদ্ধির জন্য তিনি দীর্ঘদিন ধরে মার্ক্সিস্ট-লেলিনিস্ট শব্দমালা ব্যবহার করে দেখতে পান যে,

গর্বাচেভ

www.amarboi.org

সেগুলো কোনো কাজে আসছে না। তাই–যদিও তিনি নিজে একজন নাস্তিক ছিলেন–তাঁর শাসনামলের শেষদিকে এসে কোনো কোনো ভাষণে স্রষ্টার কথা উল্লেখ করা শুরু করেছিলেন। স্বাভাবিকভাবেই, তাঁর ওই কৃত্রিম কথাবার্তা কোনো কাজে আসেনি এবং সোভিয়েত সমাজে বিশ্বাসের সংকট গভীর থেকে গভীরতর হওয়া অব্যাহত থেকেছে। ফলে অবশেষে পতন ঘটেছে বিপুলায়তন সোভিয়েত সাম্রাজ্যের।

বিংশ শতাব্দীতে শুধু কমিউনিজমের পতন ঘটেছে তা নয়, পতন ঘটেছে ফ্যাসিবাদেরও, যা ঊনবিংশ শতাব্দীর ধর্মবিরোধী দর্শনের আরেক উপজাত। ফ্যাসিবাদ হচ্ছে এমন এক দর্শন যাকে নিরীশ্বরবাদ ও প্যাগানবাদের সংমিশ্রণ বলা যায়। ফ্যাসিবাদ ঈশ্বরবাদী ধর্মগুলোর বিরুদ্ধে সদা খড়গহস্ত ছিল। ফ্রায়েডরিখ নিৎসেকে *(Friedrich Nietzsche)* বলা যেতে পারে ফ্যাসিবাদের জনক। নিৎসে অতীতের প্রতিমাউপাসক বর্বর সমাজের নৈতিকতার ভূয়সী প্রশংসা করেছেন এবং খৃস্টানধর্মসহ অন্যসব একেশ্বরবাদী ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেছেন। তিনি এমনকি নিজেকে একজন এন্টি-ক্রাইস্ট *(Antichrist)* হিসেবে তুলে ধরতেও দ্বিধা করেননি। নিৎসের শিষ্য মার্টিন হেইডেগার *(Martin Heidegger)* ছিলেন একজন নাজি *(Nazi)* সমর্থক এবং এই দুই নাস্তিক গুরু-শিষ্যের চিন্তাধারা নাজি জার্মানিকে চরম নৃশংস হতে প্ররোচিত করেছিল। মানবজাতির ওপর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধও চাপিয়ে দিয়েছিল ফ্যাসিবাদ ও কমিউনিজমের মতো নাস্তিক্যবাদী দর্শন। এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে যে, দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে প্রাণ হারিয়েছিল সাড়ে পাঁচ কোটি আদমসন্তান।

এখানে সামাজিক ডারউইনবাদ *(Social Darwinism)*-এর প্রসঙ্গও আসবে স্বাভাবিকভাবেই। প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কারণগুলোর মধ্যে অন্যতম ছিল এ-নাস্তিকতাবাদী দর্শন। হার্ভার্ডের ইতিহাসের অধ্যাপক জেমস্ জল *(James Joll)* তাঁর Europe Since 1870-নামক গ্রন্থে লিখেছেন: *"দুটো বিশ্বযুদ্ধের পেছনেই শক্তিশালী প্রভাবকের ভূমিকা রেখেছিল সামাজিক ডারউইনবাদী ইউরোপীয় নেতাদের দার্শনিক*

www.amarboi.org

দৃষ্টিভঙ্গি। এ-নেতারা বিশ্বাস করতেন যে, যুদ্ধ হচেছ একটি জৈবিক প্রয়োজন (biological necessity) এবং যুদ্ধ-বিগ্রহের মাধ্যমেই একটি জাতির জন্ম হয়।"

বিংশ শতাব্দীতে এসে নিরীশ্বরবাদের নেতিবাচক সামাজিক প্রভাব লক্ষ্য করা যায় পশ্চিমা গণতান্ত্রিক দেশগুলোতে। আজকাল পশ্চিমা বিশ্বকে 'খ্রিস্টান বিশ্ব' হিসেবে আখ্যায়িত করার একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। তবে ঊনবিংশ শতাব্দী থেকে খ্রিস্টবাদের পাশাপাশি নিরীশ্বরবাদের উপস্থিতিও পশ্চিমা বিশ্বে লক্ষ্যণীয় এবং আজ পশ্চিমা সভ্যতায় এই দুই সংস্কৃতির মধ্যে দ্বন্দ্বও সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছে। আর এ-উপাদানই পশ্চিমা সাম্রাজ্যবাদ, নৈতিক অবক্ষয়, স্বৈরতন্ত্র ও অন্যান্য নেতিবাচক ফেনোমেননের আবির্ভাবের *(পশ্চিমা সংস্কৃতিতে)* জন্য সত্যিকার অর্থে দায়ী।

আমেরিকান লেখক প্যাট্রিক গ্লাইন তাঁর God: The Evidence... নামক গ্রন্থে বিষয়টার দিকে পাঠকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন এবং পশ্চিমা সংস্কৃতিতে ঈশ্বরভীতি ও নিরীশ্বরবাদী উপাদানের মধ্যে তুলনা করার লক্ষ্যে, আমেরিকান বিপ্লব ও ফরাসি বিপ্লবের উদাহরণ টেনেছেন। আমেরিকান বিপ্লব সংঘঠিত হয়েছিল ঈশ্বর-বিশ্বাসীদের দ্বারা। তাই আমেরিকান স্বাধীনতার ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছে যে, সকল মানুষ তাদের স্রষ্টাপ্রদত্ত কিছু অধিকার ভোগ করে। অন্যদিকে ফরাসী বিপ্লব যেহেতু নিরীশ্বরবাদীদের কর্মের ফল, ফরাসী মানবাধিকার ঘোষণায় স্রষ্টার নামের কোনো উল্লেখ নেই এবং সেটি নিরীশ্বরবাদী ও নব্য প্যাগান ধ্যান-ধারণা দ্বারা পূর্ণ।

ও-দুটো বিপ্লবের ফল হয়েছিল সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন। আমেরিকায় বিপ্লবের পর একটি শান্তিপূর্ণ, সহনশীল পরিবেশের সৃষ্টি হয়েছিল, যে-পরিবেশে ধর্ম ও ধর্মীয় বিশ্বাসকে যথাযথ সম্মান করা হয়। বিপরীতভাবে, ধর্মের প্রতি তীব্র আক্রমণাত্মক মনোভাব ফরাসী বিপ্লবের পর ফ্রান্সে এত

www.amarboi.org

রক্তপাত ঘটিয়েছে এবং বর্বরতার এমন পরাকাষ্ঠা দেখিয়েছে, যা ইতিহাসে বিরল। গ্লাইন বলছেন: *" নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে নৈতিকতা ও রাজনৈতিক বিপত্তির একটি আগ্রহ-উদ্দীপক পারস্পারিক সম্পর্ক আছে।"–(দেখুন, God: The Evidence... পৃষ্টা ১৬১)*। গ্লাইন আরও উল্লেখ করেছেন যে, আমেরিকাকে নাস্তিক রাষ্ট্রে পরিণত করার চেষ্টাও মার্কিন সমাজের কম ক্ষতি করেনি। *(উদাহরণস্বরূপ)* বিংশ শতাব্দীর ষাটের ও সত্তরের দশকে ছড়িয়ে পড়া যৌন বিপ্লব (sextual revolution) সমাজের অপূরণীয় ক্ষতি সাধন করেছিল। এ-সত্য বস্তুবাদী ঐতিহাসিকরাও স্বীকার করেছেন। *–(দেখুন, God: The Evidence... পৃষ্ঠা- ১৬৩)।*

জন লেনন

ওপরে যে-সামাজিক ক্ষতির কথা বলা হলো, হিপ্পি আন্দোলন ছিল সে-ক্ষতির আরেকটি বহি:প্রকাশ। হিপ্পিরা বিশ্বাস করতো যে, ঈশ্বরবিহীন মানবতাবাদী দর্শনের মাধ্যমে এবং প্রচুর মাদক গ্রহণ ও অবাধ যৌনাচারের দ্বারা আধ্যাত্মিক মুক্তি পাওয়া সম্ভব। এই যুবক-যুবতীর দল, যারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরে রোমান্টিক গান গাইতো–জন লেননের *(John Lennon)* মতো, যিনি তাঁর গানের মাধ্যমে এমন বিশ্বের কথা বলতেন যে-বিশ্বে কোনো রাষ্ট্র থাকবে না, থাকবে না কোনো ধর্ম–তাঁরা প্রকৃত প্রস্তাবে গণ-প্রতারণার স্বীকার হচ্ছিল।

বাস্তবে তাদের ধর্মহীন জগত হিপ্পিদের জন্য করুণ পরিণতিই কেবল বয়ে এনেছিল। বিংশ শতাব্দীর ষাটের দশকের হিপ্পি নেতারা সত্তরের দশকের প্রথম নাগাদ আত্মহত্যা করেছিলেন অথবা মাদকাসক্তির কারণে বরণ করতে বাধ্য হয়েছিলেন করুণ মৃত্যুকে। বহু তরুণ হিপ্পির পরিণতিও ওই একইরকম হয়েছিল।

www.amarboi.org

যে-প্রজন্মটির যুবক-যুবতীরা হিংসার পথে পা বাড়িয়েছিল, তাঁরা অবশেষে সে হিংসার আগুনেই জ্বলেপুড়ে ছাই হয়ে গেল। ১৯৬৮ সালের ওই প্রজন্মের যারা স্রষ্টাবিমুখ হয়েছিল, হয়েছিল ধর্মবিমুখ এবং কল্পনা করেছিল যে, বিপ্লব বা স্বার্থপর ভোগবাদের মাধ্যমে মুক্তি পাওয়া সম্ভব–তাঁরা আখেরে শুধু নিজেদেরই ধ্বংস করেনি, ধ্বংস করে দিয়েছিল নিজেদের সমাজকেও ।

www.amarboi.org

নিরীশ্বরবাদ-পরবর্তী বিশ্বের সূচনাপর্ব

এ-পর্যন্ত যে-সমস্ত তথ্য-প্রমাণ তুলে ধরেছি, তাতে এটা স্পষ্ট যে, নিরীশ্বরবাদ নিশ্চিতভাবেই পতনের শেষ প্রান্তে চলে যাচেছ। অন্যভাবে বললে, মানবজাতি *(humanity)* স্রষ্টার দিকে মুখ ফেরাচেছ এবং ভবিষ্যতেও ফেরাতে থাকবে। এ-সত্য কেবল বিজ্ঞানের বিভিন্ন ক্ষেত্র এবং রাজনৈতিক পরিমন্ডলেই সীমিত নয়। বহু খ্যাতনামা রাষ্ট্রনায়ক, সিনেমার নায়ক-নায়িকা, পপগায়ক–যারা পশ্চিমা সমাজের উপর বিপুল প্রভাব বিস্তার করে থাকেন–আজকাল আগের তুলনায় অনেক বেশী ধার্মিক হিসেবে সমাজে পরিচিত হচেছন। অনেক নিরীশ্বরবাদী বা নাস্তিক এমন আছেন যারা দীর্ঘকাল নাস্তিক হিসেবে জীবন অতিবাহিত করার পর এখন সত্যকে উপলব্দি করে পুরোদস্তুর আস্তিকে পরিণত হয়েছেন *(প্যাট্রিক গ্লাইন–যার গ্রন্থ থেকে বক্ষমান নিবন্ধে প্রচুর উদ্ধৃতি দেয়া হয়েছে–একসময় নাস্তিক ছিলেন।)*

আগ্রহ-উদ্দীপক ব্যাপার হচেছ, যেসব ডেভেলপম্যান্ট *(development)* নিরীশ্বরবাদের বিরুদ্ধে কার্যকর হাতিয়ার হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে–সেগুলোর সূচনাও হয়েছিল বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের দ্বিতীয়ার্ধে। এ-সময় এ্যানথ্রোপিক প্রিন্সিপাল *(anthropic principle)* সর্বপ্রথম আত্মপ্রকাশ করে। ওই একই সময়ে ডারউইনবাদের বিরুদ্ধেও বৈজ্ঞানিক তথ্য-প্রমাণ প্রকাশিত হতে শুরু করে। ফ্রয়েডের তত্ত্বের বিরুদ্ধে যে-গ্রন্থটি 'টার্নিং পয়েন্ট' হিসেবে বিবেচিত হতে পারে সে-

www.amarboi.org

গ্রন্থটি *(The Road Less Traveled)* স্কট পিক *(Scott Peck)* লিখেছিলেন ১৯৭৮ সালে। গ্লাইন তাঁর গ্রন্থের ১৯৯৭ সংস্করণে লিখেছেন: *"গত বিশ বছরে এমনসব তাৎপর্যপূর্ণ তথ্য-প্রমাণ আমাদের সামনে হাজির হয়েছে যা দীর্ঘকাল ধরে প্রভাব-বিস্তার-করে-আসা আধুনিক ধর্মহীন বিশ্বদর্শনের (worldview) ভিত্তিকে গুড়িয়ে দেয়।"–(God: The Evidence...পৃষ্ঠা- ২)।*

নিরীশ্বরবাদী বিশ্বদর্শনের *(worldview)* পতনের অর্থ অন্য একটি দর্শনের–যে-দর্শন স্রষ্টায় বিশ্বা- করে–টিকে থাকা। বস্তুত, বিংশ শতাব্দীর সত্তরের দশকের শেষ দিকে *(অথবা হিজরী সনের হিসেবে চতুর্দশ হিজরীর প্রথম দিকে)* ধর্মীয় মূল্যবোধের জাগরণ প্রত্যক্ষ করেছে বিশ্ব। অন্যান্য সামাজিক প্রক্রিয়ার মতোই এ-জাগরণও একদিনে ঘটেনি। অধিকাংশ মানুষ এ-বিষয়ে বেখবর থাকতে পারেন, কারণ প্রক্রিয়াটি ডেভেলপ করেছে দীর্ঘকাল ধরে ধীরে ধীরে । যা হোক, যারা ওই ডেভেলপম্যান্ট গভীরভাবে পর্যবেক্ষণ করবেন তারা স্পষ্ট বুঝবেন যে, বিশ্ব এখন একটি সন্ধিক্ষণে *(turning point)* অবস্থান করছে।

নিরীশ্বরবাদী বা বস্তুবাদী ঐতিহাসিকরা ইতিহাসের এ-প্রক্রিয়াকে তাদের নিজেদের ধ্যান-ধারণার আলোকে ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করেন। কিন্তু স্রষ্টার অস্তিত্ব প্রসঙ্গে তাদের ধারণা যেমন ভুল, তেমনি এ-ক্ষেত্রেও তারা ভুল সিদ্ধান্তেই উপনীত হন। সত্যি বলতে কি, ইতিহাসের গতি-প্রকৃতি নির্ধারিত হয় স্রষ্টার ইচছানুসারেই। কুরআন বলছে: **"আল্লাহর প্যাটার্ন (pattern) তুমি বদল হতে দেখবে না। এবং আল্লাহর প্যাটার্ন-এ তুমি কোনো ধরণের পরিবর্তন (alteration) হতেও দেখবে না।"**–*(কুরআন, ৩৫:৪৩)* । বস্তুত, ইতিহাসের একটা উদ্দেশ্য *(purpose)* থাকে এবং স্রষ্টার ইচ্ছানুসারে তা প্রকাশিত হয় । স্রষ্টার ইচছা হচেছ তাঁর আলোর পূর্ণতাপ্রাপ্তি *(perfection of His light)*: **"তাঁরা তাদের মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়। অবিশ্বাসীরা অপ্রীতিকর মনে**

www.amarboi.org

করলেও, আল্লাহ্ তাঁর আলোর পূর্ণ উদ্ভাসন ব্যতীত আর কিছু চান না।"–*(কুরআন, ৯ : ৩২)*। এ-আয়াতের অর্থ হচেছ, আল্লাহ তাঁর প্রেরিত ধর্মের মাধ্যমে মানুষের জন্য তাঁর আলো পাঠিয়েছেন *(যে-আলোতে পথ চলে তারা মুক্তি পেতে পারে)*। যারা বিশ্বাস করে না, তাঁরা সে-আলো মুখ দিয়ে (ইঙ্গিতে, প্রচারনার দ্বারা, দর্শনের মাধ্যমে) নিভিয়ে দিতে চায়। কিন্তু স্রষ্টা তাঁর আলো শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে প্রকাশ করবেনই এবং পৃথিবীতে ধর্মীয় মুল্যবোধের আধিপত্য কায়েম হবেই।

আমরা নিবন্ধের শুরুতে 'ইতিহাসের সন্ধিক্ষণের' কথা বলেছি। সম্ভবত: এটিই হচেছ ইতিহাসের সে টার্নিং পয়েন্ট। যেসব তথ্য-প্রমাণ আমরা এখানে জড়ো করেছি তা-ও আমাদের ধারণাকে সমর্থন করে। অবশ্য, আল্লাহই সবকিছু ভাল জানেন।

www.amarboi.org

উপসংহার

আমরা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা সময়ে বাস করছি। নিরীশ্বরবাদ–যাকে মানুষ শত শত বছর ধরে 'যুক্তি ও বিজ্ঞানের পথ' হিসেবে চিত্রিত করার চেষ্টা করেছে–প্রমাণিত হচেছ স্রেফ যুক্তিহীনতা ও অজ্ঞতার ধারক হিসেবে। আপাতদৃষ্টিতে বিজ্ঞানকে অবলম্বন করে গড়ে-ওঠা বস্তুবাদী দর্শন অসার প্রমাণিত হয়েছে সেই বিজ্ঞানের দ্বারা-ই। নিরীশ্বরবাদের জাল থেকে আজকের বিশ্ব বেরিয়ে আসতে শুরু করেছে এবং স্রষ্টা ও ধর্মের প্রতি ক্রমবর্ধমানহারে ঝুঁকছে এবং ঝুঁকবে। এই প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বহু পূর্বে।

এটা স্পষ্ট যে, এ-সময় বিশ্বাসীদের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবার আছে। বিশ্বের চিন্তার জগতে ইতিমধ্যে যে-পরিবর্তন ঘটে গেছে এবং ভবিষ্যতে ঘটতে যাচ্ছে–সে সম্পর্কে তাদের অবশ্যই অবহিত থাকতে হবে। তাদেরকে এ-পরিবর্তন ব্যাখ্যা করতে হবে এবং বিশ্বায়ন যে-সুযোগ এনে দিয়েছে সে-সুযোগের সদ্ব্যবহার করে কার্যকরভাবে সত্যের *(truth)* প্রতিনিধিত্ব করতে হবে। তাদের অবশ্যই জানতে হবে যে, এ-বিশ্বে মৌলিক আদর্শের দ্বন্দ্বটি হচ্ছে নিরীশ্বরবাদের সঙ্গে ঈশ্বর-বিশ্বাসের। এটি অবশ্যই পূর্বের *(East)* সঙ্গে পশ্চিমের *(West)* দ্বন্দ্ব নয়। পূর্ব এবং পশ্চিম–বিশ্বের উভয়াংশেই নাস্তিক ও আস্তিক আছে। এ-দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে, বিশ্বাসী খৃষ্টান ও বিশ্বাসী ইহুদীরা বিশ্বাসী মুসলমানদের মিত্র-ই বটে। মূল বিভক্তিরেখার একপাশে মুসলমানরা ও অন্যপাশে কিতাবীরা *(খৃষ্টান ও ইহুদী)* আছে তা নয়; আসলে মূল বিভক্তিরেখার একপাশে আছে মুসলমান, খৃষ্টান ও ইহুদীরা এবং অন্যপাশে আছে নাস্তিক ও প্যাগানরা। অবশ্য, কোনো অবস্থাতেই আমাদের উচিত

www.amarboi.org

হবে না তাদের প্রতি আক্রমণাত্মক মনোভাব পোষণ করা বা প্রদর্শন করা। তাঁরা যে-ভুলের পাঁকে জড়িয়ে আছে, সে-পাঁক থেকে তাদের আত্মাকে মুক্তি দেয়ার শান্তিপূর্ণ উপায়ের কথা-ই কেবল আমরা ভাবতে পারি।

সবশেষে বলবো, দ্রুত এমন একটা যুগে আমরা প্রবেশ করতে যাচ্ছি, যে-যুগটা হবে সম্পূর্ণভাবে নাস্তিকতাবাদমুক্ত বা নিরীশ্বরবাদমুক্ত। আজো যারা নিজেদের স্রষ্টা সম্পর্কে অজ্ঞ ও বেখবর হয়ে পড়ে আছেন, ওই সময়ে তাঁরাও বিশ্বাসের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় লাভ করবেন, ইনশাআল্লাহ।◆

www.amarboi.org

আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব প্রসঙ্গ

জন্ম নেয়ার পরমুহূর্ত থেকেই মানুষ পৃথিবীতে এমন এক প্রাকৃতিক পরিবেশে বেড়ে উঠতে থাকে, যে-পরিবেশ তার জন্য সম্পূর্ণ অনুকূল। বেঁচে থাকার জন্য তার চাই অক্সিজেন। আগ্রহ-উদ্দীপক ব্যাপার হচ্ছে, যে-গ্রহে সে বাস করে, সে-গ্রহে তাকে বাঁচিয়ে রাখবার জন্য পর্যাপ্ত অক্সিজেন রেখে দেয়া হয়েছে। ফলে সে অবাধে শ্বাস নিতে পারে। বেঁচে থাকার জন্য তার উত্তাপও চাই। এ-চাহিদা মেটানোর জন্য তাপ ও আলোর উৎস হিসেবে সূর্যকে পৃথিবী থেকে এমন এক দূরত্বে স্থাপন করা হয়েছে, যাতে ঠিক যতটুকু প্রয়োজন ততটুকু তাপ ও শক্তি সে পৃথিবীতে বসে পেতে পারে। প্রয়োজন তার পুষ্টিকর খাদ্যের। পৃথিবীর আনাচে-কানাচে কত বিচিত্র ধরনের খাদ্য-ই না ছড়িয়ে-ছিটিয়ে রেখে দেয়া হয়েছে এ-প্রয়োজন মেটানোর জন্য! পানির অপর নাম জীবন। অর্থাৎ পানি ছাড়া মানুষের চলে না। পৃথিবী নামক গ্রহটির তিন-চতুর্থাংশ জুড়েই আছে পানি আর পানি! মাথা গোঁজার জন্য একটু ঠাঁইও চাই তার, চাই নিরাপদ আশ্রয়। বিস্ময়কর ব্যাপার হচ্ছে, ভুলে যাওয়া হয়নি তা-ও। পৃথিবীতে আছে সমতল ভূমি; আছে তাতে ঘরবাড়ি বানানোর জন্য প্রয়োজনীয় সব উপকরণও!

পৃথিবীকে জীবনধারণের উপযোগী করার জন্য যে লক্ষ লক্ষ উপকরণ এতে রেখে দেয়া হয়েছে, ওপরে তার মাত্র কয়েকটির উল্লেখ করা হলো। এককথায় বললে, মানুষ এমন এক পৃথিবীতে বাস করে, যাকে তার অর্থাৎ মানুষের বিভিন্ন প্রয়োজনের কথা মাথায় রেখে,

www.amarboi.org

নিখুঁতভাবে সৃষ্টি করা হয়েছে। পৃথিবী নামক গ্রহটি নিশ্চিতভাবেই 'সৃষ্টি করা হয়েছে মানুষের জন্য'।

এহেন পৃথিবীকে একজন মানুষ কীভাবে ব্যাখ্যা করবে—তা নির্ভর করে তাঁর 'অর্জিত চিন্তা-পদ্ধতি' (acquired methods of thought)-র ওপর। আর মানুষ এমনভাবে চিন্তা করে, যেভাবে চিন্তা করতে সে শিখেছে বা যেভাবে চিন্তা করতে তাকে শেখানো হয়েছে। ফলে আমরা দেখবো, অনেকেই ওপরে উল্লিখিত বিষয়গুলোকে স্রেফ 'মামুলি বাস্তবতা' *(trivial realities)* বলে উড়িয়ে দেয়ার চেষ্টা করবে। তবে যদি কেউ পূর্ব থেকে বহন-করা সব শিক্ষা ও ধারণা-অনুমান থেকে মন-মগজকে যথাসম্ভব মুক্ত করে নিয়ে, এ-পৃথিবী ও এতে আমাদের জীবনধারণের উপকরণগুলো সম্পর্কে চিন্তা করতে শুরু করে, তাহলে অবধারিতভাবেই তার মনে নীচের প্রশ্নগুলোর মতো প্রশ্ন জাগবে:

◆ কীভাবে বায়ুমন্ডল পৃথিবীর জন্য নিরাপত্তামূলক আচ্ছাদন হিসেবে কাজ করছে?

◆ মানবদেহের কোটি কোটি কোষের প্রত্যেকটি কীভাবে নিজ নিজ কাজ সম্পর্কে অবগত হলো? সে-সব কাজ তাঁরা নির্ভুলভাবে আন্‌জামই বা দিয়ে যাচ্ছে কীভাবে?

◆ কীভাবে পৃথিবীতে এমন অসাধারণ প্রতিবেশগত ভারসাম্য (ecologicl balance) বিরাজ করছে?

যে-ব্যক্তি এধরনের প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টায় রত, তিনি নিশ্চিতভাবে ঠিক পথ ধরে এগুচ্ছেন। তিনি তার চারপাশে নিত্য যা-কিছু ঘটছে, সে-সম্পর্কে নিরাসক্ত নন এবং বিশ্বের অসাধারণ প্রকৃতি সম্পর্কে নিজের অজ্ঞতার পক্ষে তিনি না-হক ওকালতি করারও চেষ্টা করেন না। তিনি প্রশ্ন করেন ও প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা করেন এবং এক পর্যায়ে এসে উপলব্ধি করেন যে, এ-পৃথিবীর প্রতিটি ইঞ্চি একধরনের পরিকল্পনা ও শৃঙ্খলার অধীন। তখন তার মনে আরো প্রশ্নের উদয় হয়:

www.amarboi.org

◆ নিখিল সৃষ্টিতে বিদ্যমান নিরবচ্ছিন্ন শৃঙ্খলা কীভাবে প্রতিষ্ঠিত হলো?

◆ কে এ-বিশ্বে সূক্ষ্ম ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করেছেন?

◆ কীভাবে পৃথিবীতে বিচিত্র আকার ও বর্ণের অসংখ্য জীবের আবির্ভাব ঘটলো?

এ-সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার জন্য চিন্তা-গবেষণা চালিয়ে গেলে যে-কেউ বুঝতে সক্ষম হবেন যেঃ এ-বিশ্ব, বিশ্বের শৃঙ্খলা এবং প্রতিটি জীবিত সৃষ্টি একটি পরিকল্পনার অংশ, একটি মহান ইচ্ছার ফসল। এ-সৃষ্টিতে কোনো খুঁত নেই। সৃষ্টির প্রতিটি সূক্ষ্ম বিষয়, একটি ছোট পতঙ্গের পাখার চমৎকার গঠনশৈলী, একটি গাছ যে-পদ্ধতিতে টনকে টন পানি বহন করে নিয়ে যায় ডালপালায়, গ্রহ-নক্ষত্রের সু-শৃঙ্খল সন্তরণ, বায়ূমন্ডলে বিভিন্ন গ্যাসের অনুপাত–ইত্যাদি হচ্ছে সৃষ্টির যথাযথতার (perfection) কয়েকটি উদাহরণ।

এ-বিশ্বের প্রতিটি স্তরে, সৃষ্টির সূক্ষ্ম উপাদানে, মানুষ খুঁজে পায় বা পেতে পারে তার স্রষ্টাকে। আল্লাহ্–বিশ্বজগতের সবকিছুর মালিক–মানুষের কাছে নিজেকে তুলে ধরেছেন সৃষ্টির এক নিখুঁত নকশা বাস্তবায়নের মাধ্যমে। আমাদের চারপাশের সবকিছু–উড়ন্ত পক্ষিকুল, অনবরত ধুকধুক করতে থাকা আমাদের হার্ট, একটি শিশুর জন্ম, আকাশে সূর্যের সগৌরব উপস্থিতি–আল্লাহ্‌র ক্ষমতার বহিঃপ্রকাশ ঘটাচ্ছে প্রতিনিয়ত। মানুষের উচিত এ-সত্যকে উপলব্ধি করা।

বিশ্বজগতের উপাদানগুলো নিয়ে চিন্তাভাবনা করলে বুঝতে কষ্ট হয় না যে, সবকিছুই সৃষ্ট *(created)*। একজন বুদ্ধিমান লোক জগতের সর্বত্রই দেখতে পায় নিখুঁত পরিকল্পনা ও বুদ্ধিমত্তার ছাপ। একজন মহান স্রষ্টার অস্তিত্ব স্বীকার করে নিতে সে তখন হয় বাধ্য। *(অতএব, সৃষ্ট জীবজগত ও জড়জগত যে আল্লাহ্‌র অস্তিত্ব ও মহানত্বর প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে, সে-সম্পর্কে অজ্ঞতার দোহাই দেবেন না। চারপাশে খুব*

www.amarboi.org

ভালো করে তাকান এবং আল্লাহর অসীম মহানুভবতার জন্য সম্ভাব্য উত্তম উপায়ে তাঁর প্রশংসা করুন।)

আল্লাহর অস্তিত্ব সুস্পষ্ট। তাঁকে অস্বীকার করার বা তাঁর অস্তিত্বের ব্যাপারটাকে উপেক্ষা করার অর্থ নিজেদেরকে জীবনের সবচে' বড় ক্ষতির পথে প্রথম কদম রাখতে বাধ্য করা। অন্যদিকে আল্লাহকে অস্বীকার করলে আল্লাহর কোনো ক্ষতি হবে না, কারণ তিনি কোনোকিছুর মুখাপেক্ষী নন। তিনি হচ্ছেন সেই একক ও অদ্বিতীয় সত্তা, যিনি তাঁর সৃষ্টির ওপর সবদিক দিয়ে রহমত বর্ষণ করে চলেছেন। আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর। কুরআন বলছেঃ *" আল্লাহ সেই চিরঞ্জীব শাশ্বত সত্তা, যিনি সমগ্র বিশ্ব চরাচরকে দৃঢ়ভাবে ধারণ করিয়া আছেন, তিনি ছাড়া আর কোনো খোদা নাই; তিনি না নিদ্রা যান, না তন্দ্রা তাঁহাকে স্পর্শ করে। আকাশমন্ডল ও পৃথিবীতে যাহা কিছু আছে সব তাঁহারই। কে এমন আছে যে তাঁহার দরবারে তাঁহার অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করিতে পারে? যাহা কিছু লোকদের সম্মুখে আছে তাহাও তিনি জানেন; আর যাহা কিছু তাহাদের অগোচরে আছে তাহাও তিনি জানেন। তাঁহার জ্ঞাত বিষয়সমূহের মধ্য হইতে কোনো জিনিষই লোকদের আয়ত্বাধীন হইতে পারে না। অবশ্য কোনো বিষয়ের জ্ঞান তিনি নিজেই যদি কাহাকেও জানাইতে চাহেন (তবে তা ভিন্ন কথা)। তাঁহার সাম্রাজ্য সমগ্র আকাশমন্ডল ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করিয়া আছে। ঐসবের রক্ষনাবেক্ষণ এমন কোনো কাজ নহে যাহা তাঁহাকে ক্লান্ত করিয়া দিতে পারে। বস্তুত তিনিই এক মহান ও শ্রেষ্টতম সত্তা।"–(সুরা বাকারাহ, আয়াত: ২৫৫)।* ◆

www.amarboi.org

মৃত্যু আমাদের যা শেখায়

একেকটি মুহূর্ত কাটে, আর আমাদের জীবনের মেয়াদ কমে। একেকটি দিন কাটে, মানুষ চলে যায় মৃত্যুর আরো খানিকটা কাছাকাছি। মৃত্যু কাছে চলে আসছে–এ-কথা যেমন অন্যের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য, তেমনি প্রযোজ্য আপনার জন্যও। আপনি এ-ব্যাপারে সচেতন আছেন কি?

কুরআন বলছে: *'প্রত্যেক জীব-ই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করিবে। অবশেষে তোমাদের সবাইকে আমাদের নিকট ফিরাইয়া আনা হইবে।'–(সুরা আল আনকাবুত, আয়াত: ৫৭)*। অতীতে যারা-ই এ-দুনিয়াতে এসেছিলেন, তাদের সবার জন্য নির্ধারিত ছিল মৃত্যুর দিনক্ষণ। কোনো ব্যতিক্রম ছাড়া-ই, তাদের সবাইকে মরতে হয়েছে। যারা চলে গেছেন, আজ তাদের মধ্যে খুব কম লোকেরই চিহ্ন খুজে পাই আমরা। আর যারা বেঁচে আছেন, এবং ভবিষ্যতে যারা বেঁচে থাকবেন–তাদের সবাইকে নির্ধারিত সময়ে মরতে হবে। অথচ মানুষের হাব-ভাব দেখলে মনে হয়, তারা মনেই করে না যে, তাদের একদিন মৃত্যুকে বরণ করে নিতে হবে।

ভাবুন সে-শিশুর কথা, যে এইমাত্র পৃথিবীর আলোয় চোখ মেলে তাকিয়েছে। ভাবুন তাঁর কথাও, যে শেষবারের মতো এ-পৃথিবীর বাতাসে শ্বাস নিচ্ছে। নিজেদের জন্ম ও মৃত্যুর ওপর এদের দুজনের কোনোভাবেই কোনো হাত নেই। একমাত্র আল্লাহই জীবন দিতে পারেন এবং জীবন নিতেও পারেন। এ-ব্যাপারে তিনিই একক ক্ষমতার অধিকারী।

www.amarboi.org

সব মানুষই একটা নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত বেঁচে থাকবে এবং তারপর মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়বে। অবধারিত এ-মৃত্যুর প্রতি মানুষের মনোভাব কী? কুরআনের বক্তব্য থেকে মেলে প্রশ্নটির উত্তর: " *বল (হে মুহাম্মাদ!), 'তোমরা যে-মৃত্যু হইতে পলায়ন কর, সে-মৃত্যুর সঙ্গে তোমাদের সাক্ষাৎ হইবে-ই। অতপর তোমাদের ফিরাইয়া আনা হইবে অদৃশ্য ও দৃশ্যের পরিজ্ঞাতা আল্লাহর নিকট এবং তোমাদের জানাইয়া দেওয়া হইবে যাহা তোমরা করিতেছিলে'।"– (সুরা আল জুমুয়া, আয়াত: ৮)*।

অধিকাংশ মানুষ-ই মৃত্যু-ভাবনা এড়িয়ে চলেন। দৈনন্দিন জীবনে মানুষ সম্পূর্ণ ভিন্ন সব বিষয়াদির মাঝে নিজেদের ব্যাপৃত রাখে। কোন কলেজে ভর্তি হতে হবে, কোন কোম্পানিতে চাকুরি নিতে হবে, আগামীকাল সকালে কোন রং-এর পোশাক পরিধান করতে হবে, দুপুরের জন্য কোন খাবার তৈরী করতে হবে–এ-ধরনের বিভিন্ন বিষয়ই তার চিন্তার রাজ্যে পায় অগ্রাধিকার। তার কাছে এ-রকম ছোটো-খাটো বিষয়গুলোর সমষ্টি-ই হচ্ছে জীবন। মৃত্যু-ভাবনা কখনো তাকে তাড়িত করে না। কদাচিৎ মৃত্যু প্রসঙ্গে কথা বলতে চাইলে, সে সবসময় অন্যের দ্বারা হয় নিরুৎসাহিত। কারণ, তাঁরা মৃত্যুর কথা শুনতে সহজবোধ করেন না। বুড়ো হয়ে গেলেই কেবল মৃত্যু আসবে–এটা ধরে নিয়েই মানুষ মৃত্যুর মতো 'অপ্রিয়' বিষয়ের সঙ্গে নিজেকে এখনই জড়াতে চায় না। অথচ বয়স যা-ই হোক, একজন মানুষ আগামী এক ঘন্টা বেঁচে থাকবে–এমন নিশ্চয়তা কেউ দিতে পারে না। প্রতিদিন সে অন্যের মৃত্যু দেখে, কিন্তু সেদিনের কথা খুব কমই ভাবে যেদিন অন্যরা তার মৃত্যু প্রত্যক্ষ করবে। তেমন এক অবধারিত পরিণতির কথা সে যেন ভাবতেই পারে না!

বাস্তবতা হচ্ছে, যখন মৃত্যু এসে দুয়ারে দাঁড়ায়, তখন জীবনের আর সব 'বাস্তবতা' হঠাৎ গায়েব হয়ে যায়। ভাবুন তো এ-মূহুর্তে আপনি কী কী করতে পারেন: আপনি চোখ মেলে তাকাতে পারেন, শরীর নাড়াতে পারেন, কথা বলতে ও হাসতে পারেন। এ-সবই আপনার শরীরের কাজ।

www.amarboi.org

এখন ভাবুন আপনার শরীরের সে-সময়ের আকৃতি ও অবস্থার কথা, যখন আপনার শরীরে প্রাণ থাকবে না অর্থাৎ আপনি মারা যাবেন।

শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পরমুহূর্ত থেকেই আপনি একতাল মাংসপিন্ড বৈ আর কিছু নন। আপনার নীরব ও নিথর দেহটিকে শেষবারের মতো গোসল দেয়া হবে। তারপর সাদা কাফনে জড়িয়ে এবং লাশবাহী খাটিয়ায় শুইয়ে সেটিকে নিয়ে যাওয়া হবে কবরস্থানে, কবরে নামিয়ে ঢেকে দেয়া হবে মাটি দিয়ে। আপনার জীবন-কাহিনীর এখানেই ঘটবে সমাপ্তি। আপনি এখন শুধুই স্মৃতি।

প্রথম কয়েক মাস বা কয়েক বছর আপনার কবর জিয়ারত করা হবে ঘন ঘন। সময় যত গড়িয়ে যাবে, আপনার কবর জিয়ারতকারীদের সংখ্যাও তত কমতে থাকবে। কয়েক দশক পরে, সে-সংখ্যা এসে দাঁড়াবে শুন্যের কোঠায়।

এদিকে আপনার মৃত্যুতে আপনার পরিবারের সদস্যদের অভিজ্ঞতা হবে সম্পূর্ণ ভিন্ন। আপনার ঘর ও বিছানা খালি করা হবে। শেষকৃত্যের পর আপনার ফেলে-যাওয়া জিনিষপত্রের খুব কমই ঘরে রাখা হবে। আপনার কাপড়-চোপড়, জুতো, ইত্যাদি গরীবদের মাঝে বিলিয়ে দেয়া হবে। প্রথম কয়েক বছর কেউ কেউ আপনার জন্য কাঁদবে। কিন্তু সময় আপনার ফেলে-যাওয়া স্মৃতিকে ক্রমশই ম্লান করে দেবে। চার বা পাঁচ দশক পর আপনাকে স্মরণ করার জন্য খুব কম মানুষ রয়ে যাবে। আরো পরে নতুন নতুন প্রজন্ম পৃথিবীতে আসবে এবং আপনার প্রজন্মের কেউ আর বেঁচে থাকবে না। আপনাকে কেউ মনে রাখলো কি রাখলো না–তা আপনার জন্য হয়ে যাবে মূল্যহীন।

মাটির ওপরে যখন ঘটবে ওসব ঘটনা, তখন মাটির নীচে আপনার দেহটি দ্রুত ক্ষয়ে যেতে থাকবে। কবরে আপনাকে শুইয়ে দেয়ার পরপরই অক্সিজেনের অভাবের সুযোগে লাশের মধ্যকার ব্যাকটেরিয়া

www.amarboi.org

ও কীটগুলো সক্রিয় হবে। এরা যে-গ্যাস রিলিজ করবে তা লাশকে ফুলিয়ে দেবে এবং এর আকৃতি ও চেহারা দেবে পাল্টে। গ্যাসের চাপে মুখ ও নাক দিয়ে বেরিয়ে আসবে রক্তময় ফেনাসদৃশ পদার্থ। শরীরের চুল, নখ, করতল ইত্যাদি খসে পড়বে। বাইরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মতো ভেতরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ, যেমন- ফুসফুস, হার্ট, যকৃত ইত্যাদিও ধ্বংস হবে। এরই মধ্যে ঘটবে সবচে কুৎসিত ব্যাপারটি: পেটের ভেতরে জমতে থাকা গ্যাসের চাপ সহ্য করতে না-পেরে পেটের চামড়া যাবে ফেটে এবং পেট থেকে বেরিয়ে আসবে দূর্গন্ধময় তরল পদার্থ। শরীরের বিভিন্ন অংশ থেকে মাংসপেশী খুলে খুলে পড়বে এবং মগজ পচে গিয়ে কাদার মতো হয়ে যাবে। এভাবে ধীরে ধীরে দেহের কংকালটি ছাড়া গোটা শরীরটাই মাটিতে যাবে মিশে ।

এখন পুরোনো জীবনে ফিরে যাবার কোনো সুযোগ আর নেই। খাবার টেবিলে পরিবারের সদস্যদের নিয়ে খেতে বসা, সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করা, বা একটি সম্মানজনক চাকুরী পাওয়া–ইত্যাদি কোনো কিছুই আর সম্ভব নয়। সংক্ষেপে বললে, মাংস ও হাড়ে গড়া আপনার যে-শরীরটাকে সমাজ একটা পরিচিতি দিয়েছে, সেটির একটা বাজে পরিণতি ঘটবে। অন্যদিকে, আপনি বা আপনার আত্মা ওই শরীরটা ত্যাগ করবেন শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করার পরমুহূর্তেই। আত্মাহীন আপনার প্রিয় শরীর বা আপনার 'বাকি অংশ' হয়ে যাবে মাটির অংশ।

এ-সবই ঘটবে। কিন্তু কেন ঘটবে?

আল্লাহ চাইলে মরদেহের অমন করুণ পরিণতি ঘটতো না। অথচ আপনার মৃত্যুর পর এমনটি ঘটবে এবং সব মানুষের ক্ষেত্রে তা-ই ঘটে; কারণ, এর মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সবার কাছে একটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ মেসেজ বা বার্তা পৌঁছে দিতে চান। তিনি চান মানুষের বোধোদয় ঘটুক; মানুষ উপলব্ধি করুক যে, বাইরের শরীরটা-ই সে নয়। বরং সে আসলে

www.amarboi.org

একটি আত্মা, শরীরটা যাকে ধারণ করে আছে। অন্যভাবে বললে, শরীরের বাইরেও তার একটি অস্তিত্ব আছে। আল্লাহ্ চান না মানুষ তার শরীরের অবশ্যম্ভাবী পরিণতি সম্পর্কে উদাসীন থাকুক। তার প্রিয় শরীরটি যে হঠাৎ করেই একদিন নিথর হয়ে যাবে, পরিণত হবে কীট-পতঙ্গের খাদ্যে–এ-কঠিন সত্যটি মানুষ ভুলে থাকুক তা মহান স্রষ্টা চান না। তিনি চান মানুষ সে-দিনটির জন্য মনে মনে সদাপ্রস্তুত থাকুক, যে-দিনটি হয়তো খুব কাছেই চলে এসেছে।

অথচ অধিকাংশ মানুষ-ই মৃত্যুকে ভুলে থাকে, এড়িয়ে চলে মৃত্যু-ভাবনাকে। আসলে মানুষের প্রকৃতিই এমন যে, সে যা পছন্দ করে না তা এড়িয়ে চলতে চায়। এমনকি কখনো কখনো সে তার অপছন্দনীয় জিনিষের অস্তিত্বই অস্বীকার করে বসে। মানুষ মরতে চায় না। তাই মৃত্যুকে, মৃত্যু-চিন্তাকে সে এড়িয়ে চলতে চায়। কোনো আপনজন মারা গেলে তার মনে পড়ে মৃত্যুর কথা। কিন্তু তা খুব বেশী সময়ের জন্য নয়। সে আবার বেখেয়াল হয়ে পড়ে। প্রায় সব মানুষ-ই মনে করে যে, মৃত্যু তার কাছ থেকে অনেক দূরে রয়েছে। সে প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনায় মানুষ মরার খবর পায়, শোনে ঘুমের মধ্যে অন্যের মৃত্যুর কথা; কিন্তু কখনোই ভাবে না যে, হঠাৎ একদিন তার অবস্থাও অমন হতে পারে। প্রত্যেকেই ভাবে যে, তার মৃত্যুর এখনো সময় হয়নি এবং সে আরো অনেক দিন বাঁচবে।

স্কুলে যাবার পথে বা কোনো গুরুত্বপূর্ণ মিটিং-এ যাবার সময় হঠাৎ করেই যে-মানুষগুলো মারা গিয়েছে, তাঁরা-ও ওই একই কথা ভেবেছিল। সম্ভবত তাঁরা কখনোই ভাবেনি যে, পরের দিনের সংবাদপত্রে তাদের মৃত্যুর খবর ছাপা হবে। এটা খুবই সম্ভব যে, আপনি যখন এ-নিবন্ধটি পড়ছেন, তখন নিজের মৃত্যুকে সন্নিকট ভাবছেন না। সম্ভবত আপনি ভাবছেন যে, আপনার এখনো মরার সময় হয়নি এবং আপনাকে সামনে অনেক কাজ করতে হবে। আপনি কি–অবচেতন মনে হলেও–মৃত্যুকে এড়িয়ে চলতে চাচ্ছেন এবং মৃত্যুর কাছ থেকে পালিয়ে

www.amarboi.org

বাঁচবার ব্যর্থ চেষ্টা করছেন? অথচ কুরআন বলছে: *"বল, 'তোমাদের কোনো লাভ হইবে না যদি তোমরা মৃত্যু বা হত্যার ভয়ে ভীত হইয়া পালাইয়া বেড়ানোর চেষ্টা কর; (যদি তোমরা পালাইতে সক্ষম-ও হও তাহা হইবে স্বল্প সময়ের জন্য) এবং তোমাদের খুব সামান্যই ভোগ করিতে দেওয়া হইবে'।"–(সুরা আল-আহঝাব, আয়াত: ১৬)।*

মানুষকে একা করে সৃষ্টি করা হয়েছে এবং তার উপলব্ধি করা উচিত যে, তাকে একা অবস্থাতেই মৃত্যুবরণ করতে হবে। তা না, সে প্রায় গোটা জীবনটাই কাটিয়ে দেয় দুনিয়ার ধন-সম্পদের নেশায় বুঁদ হয়ে। তার জীবনের একটাই লক্ষ্য: কী করে আরো সহায়-সম্পত্তির মালিক হওয়া যায়। এ-লক্ষ্য পূরণের জন্য সে অন্যায়-অপরাধ করতেও পিছপা হয় না। যদিও কঠিন বাস্তবতা হচ্ছে, কেউ ধন-সম্পদ নিয়ে কবরে যেতে পারে না। তাকে কাফনের যে একপ্রস্থ কাপড় দিয়ে মুড়িয়ে কবরে শোয়ানো হবে– তা-ও স্বল্পমূল্যের-ই হবার কথা। মৃত্যু হঠাৎ করেই উদয় হয়ে তাকে করে দেবে একা ও নিঃস্ব। অথচ মৃত্যুর কথা ভুলে না-গিয়ে যদি কেউ আল্লাহর দেয়া জীবনবিধান অনুসারে পৃথিবীতে জীবনযাপন করে, তবেই কেবল মৃত্যু তাকে নিঃস্ব ও অপ্রস্তুত অবস্থায় পাবে না। সে সর্বদাই তার ঈমান ও আমল নিয়ে দুনিয়া থেকে চলে যেতে প্রস্তুত। বস্তুত, ধন-সম্পদ বা সন্তান-সন্ততি নয়, মৃত্যুর পর কেবল ঈমান ও আমল-ই মানুষের সঙ্গে থাকে বা থাকতে পারে। প্রতিজন মানুষের মৃত্যু আমাদের বারবার এ-শিক্ষাই দিয়ে যাচ্ছে। কিন্তু কতজন সে-শিক্ষা গ্রহণ করে? ♦

অনুবাদক পরিচিতি

আলিমুল হকের জন্ম ঢাকায়। তাঁর গ্রামের বাড়ি অবশ্য কুমিল্লায়। মাতা (মৃত) মমতাজ বেগম। পিতা খন্দকার আজিজুল হক। ১৯৮৪ সালে ঢাকা বিভাগ থেকে এসএসসি পাস করেছেন। উচ্চ মাধ্যমিক পর্যায়ে পড়াশোনা করেছেন নটর ডেম কলেজে। সাংবাদিকতায় অনার্স ও মাস্টার্স ডিগ্রী অর্জন করেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ থেকে।

১৯৯৫ সাল থেকে দৈনিক ইত্তেফাকের সম্পাদকীয় বিভাগে কর্মরত আছেন। ইত্তেফাকে **সমদর্শন** শিরোনামে এবং **মৃন্ময়** ছদ্মনামে নিয়মিত কলাম লিখছেন।

ব্যক্তিগত জীবনে তিনি বিবাহিত *(স্ত্রী জয়শ্রী জামান)* এবং এক কন্যা *(মুহসেনা মুমতাজ)* ও এক পুত্রের *(মুহাম্মাদ বিন আলিম)* জনক।

মিথ্যা মামলায় আদালতে নেয়া হচ্ছে হারুন ইয়াহিয়াকে

হারুন ইয়াহিয়া তুরস্কের আংকারায় জন্মগ্রহণ করেন ১৯৫৬ সালে। হারুন ইয়াহিয়া নামে তিনি সুপ্রসিদ্ধ হলেও, এটি আসলে তাঁর ছদ্মনাম (pen-name) তাঁর পিতৃপ্রদত্ত নাম হচ্ছে **আদনান ওকতার** (Adnan Oktar)

আংকারাতেই তাঁর জীবন কেটেছে উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা শেষ হওয়া পর্যন্ত। উচ্চ মাধ্যমিক শ্রেনীতে অধ্যয়নের সময় থেকেই তিনি নিজেকে ইসলামের খেদমতে পেশ করার অদম্য আকাঙ্খা পোষণ করতে শুরু করেন। এ-সময় তিনি প্রচুর পড়াশোনা করেন, বিশেষ করে ইসলাম সম্পর্কে প্রভুত জ্ঞান অর্জন করেন। ১৯৭৯ সালে তিনি মিমার সিনান বিশ্ববিদ্যালয়ে (Mimar Sinan University) পড়ার জন্য ইস্তাম্বুল গমন করেন। এ-বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়নকালেই তিনি মানুষকে বিশ্বাসের দিকে এবং ইসলামী মূল্যবোধের দিকে আহ্বান করাকে জীবনের মিশন হিসেবে গ্রহণ করেন।

বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লিঃ
চট্টগ্রাম-ঢাকা